Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের সৌন্দর্যতা সমূহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারজানা আক্তার চৌধুরী নিলা

রোলঃ 23090121243

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের সৌন্দর্যতা সমূহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারজানা আক্তার চৌধুরী নিলা

রোলঃ 23090121243

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের সৌন্দর্যতা সমূহ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মারজানা আক্তার চৌধুরী নিলা, আইডিঃ 23090121243 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের সৌন্দর্যতা সমূহ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মারজানা আক্তার চৌধুরী নিলা

আইডিঃ 23090121243

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় এক 5

ভূমিকা 5

অধ্যায় দুই 8

ইসলামের মৌলিক সৌন্দর্য 8

অধ্যায় তিন 24

অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলামের সৌন্দর্য 24

অধ্যায় চার 42

ইসলাম ও চিকিৎসাবিজ্ঞান 42

অধ্যায় পাঁচ 55

ইসলাম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর নিরাপত্তা ও সম্মান প্রদানের অনন্য দৃষ্টান্ত 55

অধ্যায় এক

ভূমিকা

শুরুর কথা

বর্তমান বিশ্বে খুন, রাহাজানি, সংঘাত চারদিকে।ধর্মীয় মূল্যবোধ নেই বললেই চলে।ধর্মীয় শিক্ষাকে কেবল বই পুস্তকের মাঝে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। কোথাও এ শিক্ষার প্রায়োগিক দিক মিললেও তা শুধু মিলে আচার অনুষ্ঠানে।

কিন্তু ইসলাম শুধু আচার অনুষ্ঠানের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকার নয়।ইসলাম তো পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। যা মানব চরিত্রের প্রত্যেক কদমে কদমে বিস্তৃত। ইসলাম শিক্ষা দেয় ন্যায়, করুণা, শান্তি ও মানবিক সহাবস্থান প্রতিষ্ঠা করার। ইসলামের দূত হযরত মুহাম্মদ (সা.) অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি যে আচরণ প্রদর্শন করেছেন, তা আজও মানবতার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا{

অর্থাৎ, আজ অবিশ্বাসিগণ তোমাদের ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না, শুধু আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসাবে মনোনীত করলাম। (মায়িদাহঃ ৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

إن الدين عند الله الإسلام

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম।" (সূরা আল ইমরান: আয়াত ১৯)

তবে ইসলাম অন্য ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল । সমাজ গড়ে উঠেই একাধিক ধর্মের সহাবস্থানে। ইসলাম অন্যের ধর্ম পালনে বাধা দেয় না কখনো।

মহান আল্লাহ বলেন,

"তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য, আর আমার ধর্ম আমার জন্য" (সূরা কাফিরুন, আয়াত ৬)

অন্য ধর্মের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কেবল তাত্ত্বিক নির্দেশনায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা বাস্তব জীবনের আচরণে প্রতিফলিত হয়েছে ইতিহাসের নানা সময়ে। ইসলামী সভ্যতায় খ্রিষ্টান, ইহুদি, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তা, সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করার উদাহরণ

অসংখ্য। ইসলাম অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, আলোচনার সংস্কৃতি এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে সহাবস্থানের যে শিক্ষা দিয়েছে, সেটিই ইসলামের সৌন্দর্যের এক অনন্য প্রকাশ।

গবেষণার উদ্দেশ্য

ইসলাম মানবিকতার ধর্ম। মহান আল্লাহর নিকট ইসলাম ই একমাত্র মনোনীত ধর্ম হলেও, অন্য ধর্মের প্রতিও ইসলাম শ্রদ্ধাশীল।

এছাড়াও ইসলাম শুধু উপাসনার মাঝেই সীমাবদ্ধ না। ন্যায়,করুণা, সহনশীলতা, সহিষ্ণুতার মাঝেও ইসলাম বিস্তৃত -

- ☐ ইসলাম ন্যায়ের ধর্ম
- ☐ ইসলাম করুণার ধর্ম
- ☐ ইসলাম মানবিক গুণাবলিকে সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করে
- ☐ ইসলাম ডিপ্রেশনের প্রেসক্রিপশন
- ☐ ইসলামের হুকুম আহকাম মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।
- ☐ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক,
- ☐ তাদের প্রতি মুসলিম দের আচরণ,
- ☐ বিভিন্ন ধর্মের সহাবস্থান নিয়ে আলোচনা করা

এসবকিছুই ইসলামের সৌন্দর্য। যা বিশ্লেষণ করাই হচ্ছে এই গবেষণার উদ্দেশ্য।

গবেষণার গুরুত্ব

এই অশান্তির, অসহিষ্ণুতার যুগে ইসলামের প্রকৃত বার্তা (শান্তি,ন্যায়,মানবতা) সম্পর্কে একটা যুক্তিনির্ভর ধারণা লাভ করা যাবে।

ইসলাম শুধু নামায, রোযা,হজ্জ,যাকাতের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়।এই গবেষণার মাধ্যমে জীবনের প্রতিটা পদক্ষেপে ইসলামের বিস্তৃতি জানা সম্ভব হবে।

জীবনের কোনো এক প্রান্তে এসে নিজেকে খুব অসহায় মনে হলে,ইসলাম যে সেখানেও পথ বাতলে দেয় সেটা অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

জানা যাবে,ইসলামে আল্লাহর হক্বের পাশাপাশি বান্দার হক্বের গুরুত্ব । নিজ ধর্মের পাশাপাশি অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা।

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা ও ইসলামের সৌন্দর্য, সৌহার্দপূর্ণ আচরণ অনুধাবন করতে পারবেন।

“ধর্মের সৌন্দর্য” বলতে কি বোঝায়

ধর্মের সৌন্দর্য বলতে বোঝায় নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, ভালোবাসা, এবং ইতিবাচক গুণাবলির সমষ্টি, যা মানুষের হৃদয় ও চরিত্রকে প্রভাবিত করে। যা মানুষের বাহ্যিক রূপের থেকেও অভ্যন্তরীণ রূপের মাঝে অধিক প্রকাশিত হয়।

ধর্মের সৌন্দর্য এমন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা যা মানুষকে সৃষ্টিকর্তার নিকটবর্তী করে। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকে আরো জানতে আগ্রহী করে।

- যার মাধ্যমে মানুষ পায় -
- মানুষকে ভালোবাসার শিক্ষা
- ন্যায়ের পথে চলার প্রেরণা
- অন্যের প্রতি সহানুভূতি ও দয়ার আহ্বান
- আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের দিশা

ইসলামি স্কলাররা বলেন, ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য পেতে হলে পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করতে হবে।

আল্লাহ তা’আলা নিজেই বলেছেন, ‘হে মুমিনরা! তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।’ (সূরা বাকারাহ : ২০৮)

অধ্যায় দুই

ইসলামের মৌলিক সৌন্দর্য

ইসলামের সৌন্দর্য

ইসলামের মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে পঞ্চস্তম্ভ (কালেমা, নামায, রোজা, হজ, যাকাত) আর নৈতিক সামাজিক মূল্যবোধ।যা মানুষকে একটি সুগঠিত জীবন দেয়।যার ফলে মানুষ আরো আল্লাহর নিকটবর্তী হয়।

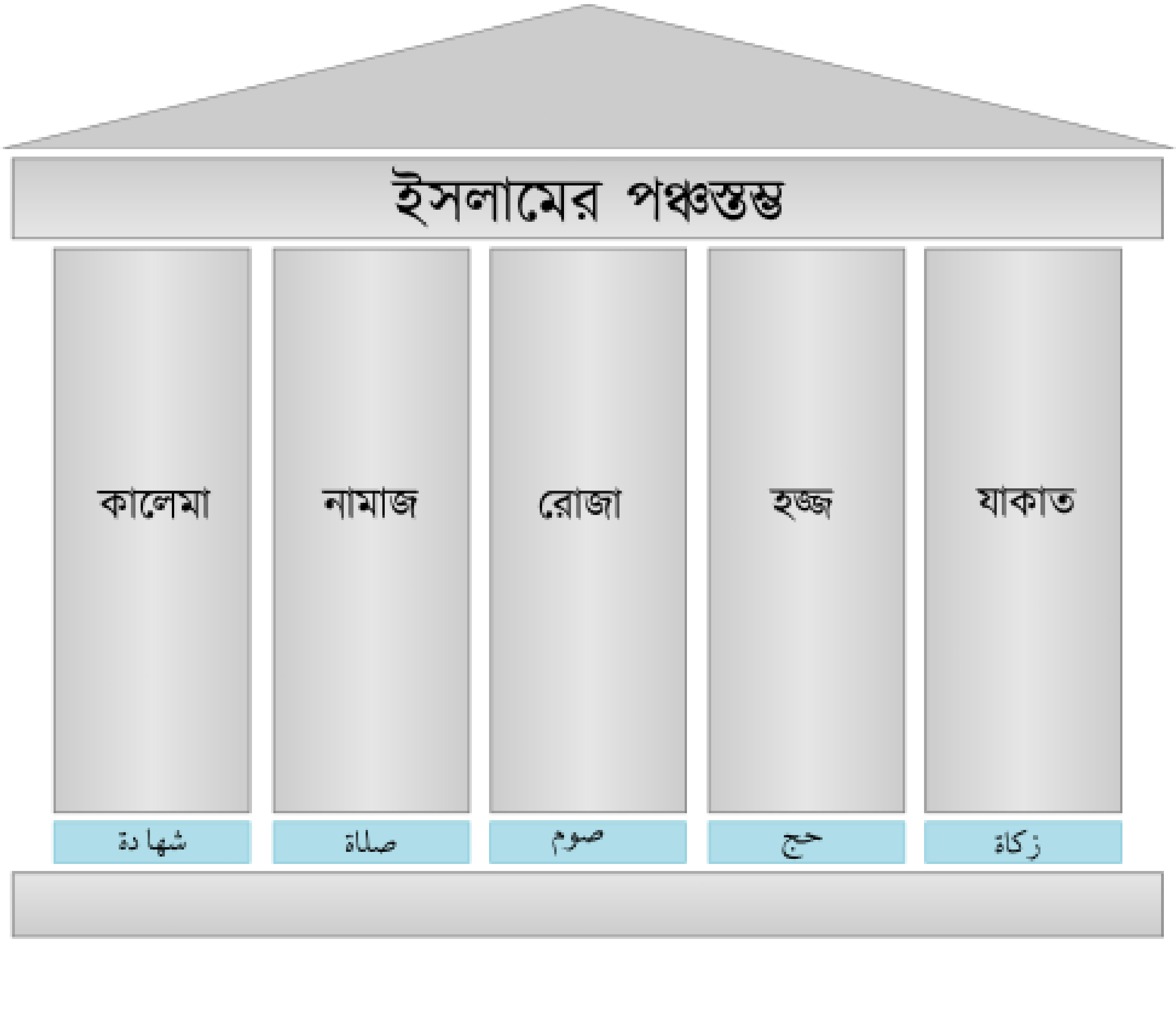

ছবি – ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ [উইকিপিডিয়া]

কালেমা মানে আল্লাহর একত্ববাদে এবং তাঁর প্রেরিত রসূল(স.) এর উপর ঈমান রাখা।আরো বিস্তারিত ভাবে বলতে গেলে, আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিশতাগণের উপর, তাঁর আসমানী কিতাব সমূহের উপর, তাঁর রাসুলগণের উপর, পরকালের উপর এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর, যা আল্লাহ পাকের নিকট হতে হয়ে থাকে এবং মৃত্যুর পর পূনরায় জীবিত হওয়ার উপর।

"ইসলামে আল্লাহর একত্ব বা একহাতে সব কিছু নিয়ন্ত্রণের ধারণা সৌন্দর্যের মূল ভিত্তি। আল্লাহ ই "অসীম সুন্দর" (الجميل) — এবং যা কিছু সুন্দর, তা আল্লাহর সৃষ্টি ও প্রতিবিম্ব। "

- Hamad Bin Khalifa University

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3)

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ} (٤)

অর্থাৎ, বল, তিনিই আল্লাহ একক (অদ্বিতীয়)। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী (স্বয়ংসম্পূর্ণ)। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। (ইখলাসঃ ১-৪)

ইসলাম মানুষকে এক আল্লাহর দাসত্ব শিখায় এবং অন্যের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়।

ইসলাম শব্দটির বুৎপত্তির দিকে তাকালে দেখা যায়,

আরবি 'স-ল-ম' (س-ل-م) ধাতু থেকে ইসলাম' শব্দটি উদ্ভূত, যার মূল অর্থ হলো শান্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি। এই শব্দের দুটি প্রধান অর্থ আছে।

বুৎপত্তিগত অর্থ হলো শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং

ধর্মীয় অর্থ হলো আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। তাই, ইসলাম বলতে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করাকে বোঝায়। আর ইসলাম ধর্ম মেনে চলা ব্যক্তি হচ্ছে মুসলিম।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ{

(٨٩)سورة النحل

অর্থাৎ, আর আমি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) দের জন্য, পথনির্দেশ, করুণা ও সুসংবাদ স্বরূপ। (নাহল: ৮৯)

নামায ইসলামের ২য় স্তম্ভ। নামায বাংলা শব্দ।যার আরবি হচ্ছে সালাত।

প্রত্যেক মুসলিম কে আল্লাহ তা'আলা নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত নামায আদায় করার আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন,
‘তুমি সূর্য হেলার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামাজ কায়েম করো এবং ফজরের নামাজ (কায়েম করো) ।নিশ্চয়ই ফজরের নামাজে সমাবেশ ঘটে।’ (সুরা বনি ইসরাঈল, আয়াত: ৭৮)

এখানে, সূর্য হেলার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত বলতে জোহর,আসর,মাগরিব, এশার কথা বুঝানো হয়েছে। আর ফজরের নামাজকে আল্লাহ ত'আলা আলাদা ভাবে উল্লেখ করেছেন এর বিশেষত্ব বুঝানোর জন্য। কারণ এ নামাজের সময় ফেরেশতাদের সমাবেশ ঘটে।যারা আল্লাহর কাছে বান্দার নামাজের ব্যপারে সাক্ষ্য দেয়।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ আরো
নির্দেশ দিয়েছেন:
‘এবং তুমি নামাজ কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয়ই নেক আমল মন্দ কর্মগুলোকে দূর করে দেয়। স্মরণকারীদের জন্য এটি একটি স্মারক।’ (সুরা হুদ, আয়াত: ১১৪)
নামাজ আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে আত্নিক সেতুর মতো।বান্দা যখন খুশু খুজু নিয়ে,পরিষ্কার কাপড়ে আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হয় তখন রবের সাথে বান্দার সরাসরি যোগসূত্র তৈরি হয়।যেখানে তৃতীয় কেউ থাকে না।
এই যে রবের সাথে বান্দার সম্পর্ক এটাই ইসলামের সৌন্দর্য।
একটি হাদীসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার খুব চমৎকার এক উদাহরণ দিয়ে ইরশাদ করেন-

'বলতো! যদি তোমাদের কারো বাড়ীর আঙ্গিনায় একটি নদী প্রবাহিত হয় আর সে ঐ নদীতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তবে কি তার শরীরে কোন ধরনের ময়লা অবশিষ্ট থাকবে? সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) বললেন: হুযূর! কোন ময়লাই থাকবে না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-দেখ! পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও এমনই। আল্লাহ তাআলা এর বরকতে গুনাহ ও পাপসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেন।'(বুখারী, মুসলিম)

জামাতে নামাযের ফযীলত

নামায এমন এক ইবাদত যার দ্বারা শুধু আখিরাতের ফায়দাই হাসিল হয় না বরং সমাজের মানুষের মাঝে সম্প্রীতি তৈরি হয়। বৈষম্য দূর হয়।

- ❖ সময়ানুবর্তিতা আয়ত্ত হয়।
- ❖ পাচ বার মহল্লার মানুষের সাথে সাক্ষাত
- ❖ সৎলোকদের সাহচার্য
- ❖ একাকী নামাযের ২৭ গুণ বেশি সওয়াব
- ❖ ধনী গরিব, আত্নীয়- অনাত্নীয় সবাই এক কাতারে কাধে কাধ মিলিয়ে নামায আদায় করে।যেখানে কোনো অহংকার থাকে না।

জামাতে নামাযের হুকুম দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষের মাঝে বর্ণ,বংশ মর্যাদার বৈষম্য দূর করে দিয়ে সম্প্রীতি এনে দিয়েছেন।

রোযা বা রোজা (ফার্সি روزه রুজ়ে), সাউম বা সাওম (আরবি صوم স্বাউম্, অর্থঃ সংযম), বা সিয়াম হলো ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মূল ভিত্তির তৃতীয়। সাওমের অর্থ বিরত থাকা, আত্মসংযম, পরিশুদ্ধি। সুবহে সাদিক বা ভোরের সূক্ষ্ম আলো থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার,পাপাচার, কামাচার, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি এবং সেই সাথে যাবতীয় ভোগ-বিলাস থেকেও বিরত থাকার নাম রোযা। [Wikipidia]

রোযার উপকার

১।আত্মশুদ্ধি ও সংযম শেখায়

জনাব নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

'যখন তোমাদের রোযার সময় হয়, তখন তোমাদের বাজে কথাবার্তা মুখ থেকে বের করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কোন শোরগোলও করবে না, যদি তাকে কেউ গালি দেয় বা তার সাথে ঝগড়া করতে আসে, তবে সে সোজা এটা বলে দিবে যে, আমি রোযাদার। (এজন্য তোমার গালির জবাব দিতে পারছি না।।)

অন্য এক হাদীসে হুযুব শায়াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন--

'যে ব্যক্তি রোযা রেখেও বাজে কথাবার্তা এবং অসৎকাজ ত্যাগ করে না, তবে তার খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করার কোন প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার নেই।'

২। **পাপ থেকে রক্ষা করে।**

৩। **রোজার প্রতিদান আল্লাহ নিজে দেবেন।**

হজরত সাহল বিন সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, জান্নাতের একটি দরজা আছে, একে রাইয়ান বলা হয়। এই দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন একমাত্র রোজা পালনকারী ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া অন্য কেউ এই পথে প্রবেশ করবে না।

“সেদিন এই বলে আহ্বান করা হবে- সিয়াম পালনকারীগণ কোথায়? তারা যেন এই পথে প্রবেশ করে। এভাবে সব সিয়াম পালনকারী ভেতরে প্রবেশ করার পর দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। অতঃপর এ পথে আর কেউ প্রবেশ করেবে না। (সহিহ বুখারি : ১৮৯৬, সহিহ মুসলিম : ১১৫২)**”**

৪। **রোজার মাধ্যমে গরীবদের অনাহারে,অর্ধাহারে থাকার কষ্ট কিছু হলেও বুঝা যায়।ফলে সমাজের ধনবান ব্যক্তিবর্গ গরিবদের প্রতি সদয়বান হন।**

এছাড়াও রসুলল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন,
"রোজাদারের জন্য দুটি খুশি।একটি হলো তার ইফতারের সময়, আর অপরটি হলো আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়।" —(বুখারী ও মুসলিম)

যাকাত ((الزكاة শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো 'বৃদ্ধি', 'পবিত্রতা', 'আধিক্য' এবং 'প্রবৃদ্ধি'। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআনে "যাকাত" শব্দের উল্লেখ এসেছে ৩২ বার।
আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)

‘‘সালাত কায়িম কর ও যাকাত আদায় কর।’’ (আল-বাকরাহঃ ৪৩, ৮৩, ১১০)

ইসলামী পরিভাষায়, যখন কোনো মুসলিম নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হন এবং সেই সম্পদ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর নির্দিষ্ট অংশ (সাধারণত ২.৫%)দরিদ্র ও অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করেন, তখন তাকে যাকাত বলা হয়। [উইকিপিডিয়া]
নিসাব পরিমাণ সম্পদ মানে, ন্যূনতম পক্ষে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা তার সমপরিমাণ অর্থসম্পদ জমা থাকা।

যাকাতের খাত সমূহঃ

যাকাত দেয়ার ব্যপারে কুরআনে ৮ টি খাত উল্লেখ আছে।
১.ফকির (যার কোনো সম্পদ নেই)।
২.মিসকীন (যার সামান্য সম্পদ আছে)।
৩.যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারী (যার অন্য জীবিকা নেই)।

৪.নতুন মুসলমান (আর্থিক সংকটে থাকলে)[২০]।
৫.ক্রীতদাস মুক্তির উদ্দেশ্যে
৬.ধনী সম্পদশালী ব্যক্তি যার সম্পদের তুলনায় ঋণ অনেক বেশি
৭.স্বদেশে ধনী হলেও বিদেশে আল্লাহর পথে জিহাদে রত ব্যক্তি
৮.মুসাফির (যিনি ভ্রমণকালে অভাবের মধ্যে আছেন)

তবে যাকাত দাতা ও গ্রহিতা উভয়ের অন্তরে তাওহীদের বিশ্বাস কে লালন করতে হবে
ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু‘আয (রাঃ)-কে ইয়ামান দেশে (শাসক হিসেবে) প্রেরণ করেন। অতঃপর বললেন, সেখানকার অধিবাসীদেরকে এ সাক্ষ্য দানের প্রতি আহবান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত কর যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর প্রতি দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন। যদি সেটাও তারা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত কর যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর তাদের সম্পদের মধ্য থেকে সাদাকা (যাকাত) ফরজ করেছেন। যেটা ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর দরিদ্রদের মাঝে প্রদান করা হবে। (১৪৫৮, ১৪৯৬, ২৪৪৮, ৪৩৪৭, ৭৩৭১, ৭৩৭২) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৩০৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৩১০)

যাকাতের পার্থিব উপকার:
- ধনী গরিবের মাঝে সেতু বন্ধন তৈরি হয়
- গরীবদের জীবিকার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়
- সম্পদ শুধু ধনীদের মাঝে পুঞ্জিভূত না থেকে গরীবের মাঝেও বন্টিত হয়।
- ধনী গরিবের মাঝে বৈষম্য কমে।

যাকাত প্রদানের হুকুম এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সমাজের ধনী ও দরিদ্রের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করে দিয়েছেন।

হজ আরবি শব্দ।ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তম্ভ। যার অর্থ - ইচ্ছা করা', 'গমন করা' বা 'সংকল্প করা'।

জিলহজ মাসের নির্দিষ্ট দিনে ইহরাম বেঁধে আরাফার ময়দানে অবস্থান করা, বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা এবং অন্যান্য কিছু নির্দিষ্ট আমল যথাযথভাবে আদায় করাকে হজ বলে।

জিলহজ মাসের ৮ থেকে ১২/১৩ তারিখের মাঝে হজ পালন করতে হয়।

আল্লাহ প্রত্যেক সুস্থ, সবল, বিবেকবান, সামর্থ্যবান প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য হজ ফরজ। হজ হলো মুসলমানদের জন্য মিলনমেলা, যাকে বলা হয় মহাসম্মেলন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে

আসা মুসলমান পবিত্র মক্কা-মদিনায় জিলহজ মাসে কিছুদিনের জন্য একত্রিত হয়। তাদের ভাষা, আচার-আচরণ, চলাচল, পোশাক, আকার-আকৃতি সর্বব্যাপী প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কালচার হওয়া সত্ত্বেও সবাই এক মনে, একই সাদা পোশাকে মহান আল্লাহর ডাকে একত্রিত হয়। সবার মুখে এক আল্লাহর নাম। আল্লাহতায়ালা হজ ফরজ করে গোটা মুসলিম জাতিকে একত্র করার সুযোগ করে দিয়েছেন। একে অন্যের ভাষা, আচরণ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক রীতিনীতি বুঝতে, একে অন্যের সংস্কৃতি জানতে হজ এক অপরূপ মিলনমেলা! হজের মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি হয়।

কুরআন ইসলামের সবচেয়ে মহিমান্বিত সৌন্দর্য হল আল কুরআন। যার আধ্যাত্মিকতা ছড়িয়ে পড়েছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে।এটা এমন ওক আসমানী কিতাব যেখানে আছে মানব জীবনের সৃষ্টির সূচনা থেকে তার ইহকাল, পরকাল সব কিছু।

আল্লাহ বলেন,
هُوَ الَّذِىۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ تُرَابٍ ثُمَّ مِنۡ نُّطۡفَةٍ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلًا ثُمَّ لِتَبۡلُغُوۡۤا اَشُدَّكُمۡ ثُمَّ لِتَكُوۡنُوۡا شُيُوۡخًا ۚ وَ مِنۡكُمۡ مَّنۡ يُّتَوَفّٰى مِنۡ قَبۡلُ وَ لِتَبۡلُغُوۡۤا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ ﴿۶۷﴾

তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, পরে শুক্র বিন্দু হতে, তারপর তাদেরকে বের করেন শিশু রূপে, অতঃপর তোমরা উপনীত হও যৌবনে, তারপর হও বৃদ্ধ। তোমাদের মধ্যে কারও এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং এটা এ জন্য যে, তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।
(সূরা আল মুমিনুন :৬৭)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,
خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَ اَنۡزَلَ لَكُمۡ مِّنَ الۡاَنۡعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزۡوَاجٍ ؕ يَخۡلُقُكُمۡ فِىۡ بُطُوۡنِ اُمَّهٰتِكُمۡ خَلۡقًا مِّنۡۢ بَعۡدِ خَلۡقٍ فِىۡ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمۡ لَهُ الۡمُلۡكُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصۡرَفُوۡنَ ﴿۶﴾

তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে। অতঃপর তিনি তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের দিয়েছেন আট প্রকার গৃহপালিত পশু। তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ! তোমাদের রাব্ব। সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোন মা‘বূদ নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ? (সূরা যুমার:৬)

মানব বৈশিষ্ট্য দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ
منوعاً (٢١) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (٢٢) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (٢٣..)

অর্থাৎ, মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে। যখন তাকে বিপদ স্পর্শ করে, তখন সে হয় হা-হুতাশকারী। আর যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে হয় অতি কৃপণ। অবশ্য নামাযীগণ এর ব্যতিক্রম; যারা তাদের নামাযে সদা নিষ্ঠাবান। (সূরা মাআ'রিজঃ ১৯-২৩)

এই জীবনকে যখন মূল্যহীন মনে হয় তখন আল্লাহ অভয় দিয়ে বলেন,

"لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ"

"আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।" — সূরা আজ-জুমার ৩৯:৫৩

বান্দার যখন সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুনাহ নিয়ে ভাবতে থাকে, কোন চেহারায়, কি হৃদয় নিয়ে আল্লাহর সামনে দাড়াবো,

তখন আল্লাহ বলেন,

"ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ"

"তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।"— সূরা গাফির ৪০:৬০

অশান্ত মনে কুরআন স্নিগ্ধতার পরশ বুলিয়ে দেয়। চারিদিক যখন দূর্বিষহ হয়ে উঠে, কোথাও গিয়ে যখন এক মুঠো শান্তি মেলে না, কারো কথায় যখন এই ক্ষতবিক্ষত হৃদয় জোড়া লাগে না,

আল্লাহ হাত বাড়িয়ে বলেন,

"أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ"

"জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় শান্তি পায়।" — সূরা আর-রাদ ১৩:২৮

সীমাহীন কষ্টের জীবনে কোথাও যখন সান্তনা মিলে না, তখন আল্লাহ দিয়েছেন সান্তনা,

فَاِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ يُسۡرًا ۙ﴿۵﴾ اِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ يُسۡرًا ؕ﴿۶﴾

কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে। অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে। (সূরা আল- ইন শিরাহ :৫-৬)

চরম অশান্ত জীবনে শান্তির পরশ তো কুরয়ানের প্রতিটা পাতায় পাতায় নিহিত।কুরআন তো আত্নার থেরাপি। সান্তনার দরজায় সবচেয়ে স্নিগ্ধতার পরশ।

জীবনের সূর্য যেখানে অস্তমিত হয়,আল্লাহ সেখানে কুরআনে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের করে দিয়েছেন।

ন্যায়/ইনসাফ

বর্তমান বিশ্বে যখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষ ন্যায়ের খোঁজে ছুটে বেড়াচ্ছে, তখন জানতে ইচ্ছে করে; ইনসাফের প্রকৃত রূপ কেমন হওয়া উচিত? অথচ ইসলাম সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে বহু আগেই।

আর রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবন দিয়ে শিখিয়েছেন, “ন্যায় ছাড়া শান্তি নেই, আর ইনসাফ ছাড়া সৌন্দর্য নেই।”

ইনসাফের হুকুম শুধু মুসলিমদের জন্য নয়।বরং সমাজের সর্ব স্তরের সকল মানুষের জন্য ইনসাফের হুকুম আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন।হোক তা মনিব কিংবা দাস, বন্ধু অথবা শত্রু, কৃষ্ণ বা শেতাঙ্গ।

আল্লাহ বলেন,

‘হে মুমিনরা, তোমরা আল্লাহর (বিধানাবলি পালনের) জন্য সদাপ্রস্তুত হয়ে যাও (এবং) ইনসাফের সঙ্গে সাক্ষ্যদানকারী এবং কোনো সমপ্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের ইনসাফ পরিত্যাগে প্ররোচিত না করে।

ইনসাফ অবলম্বন করো। এ পন্থাই তাকওয়ার বেশি নিকটবর্তী। এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত। ’ (সুরা : মায়েদা, আয়াত : ৮)

নবুয়তের আগে ও পরে সর্বদা ই আল্লাহর রাসুল সাঃ ছিলেন ইনসাফের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হিলফুল ফুজুল

হারাম মাসের সম্মান ও ইজ্জত লংঘন করা হয়েছিল ফিজার যুদ্ধে। যার ফলে যুদ্ধের পরপরই আরবের কুরাইশের কয়েকটি গোত্র যথা বনু হাশিম, বনু মুত্তালিব, আসাদ বিন আব্দুল উয্যা, যুহরা বিন কিলাব ও তাইম ইবনে মুররা ফুল কা'দ মাসে হিলফুল ফুযূল গঠনের প্রস্তাব দেয়। এরপর তারা সকলেই এ লক্ষ্যে তাদের বয়োবৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত সরদার আব্দুল্লাহ বিন জুদআন তাইমীর ঘরে সমবেত হয়। তারা হিলফুল ফুযূল গঠন করে এবং অঙ্গীকার ব্যক্ত করে যে, গোটা মক্কায় যে কোনো মযলুমের পাশে গিয়ে তারা দাঁড়াবে। আর যে অন্যের ওপর যুলুম করবে তার কাছ থেকে যুলুমের দায় আদায় করে ছাড়বে। রাসূলে কারীমও সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মৈত্রীচুক্তিতে উপস্থিত ছিলেন। রিসালতের মহা সম্মানে ভূষিত হওয়ার পরে একদিন তিনি বলেছিলেন, 'আব্দুল্লাহ বিন জুদআনের ঘরে আমি এমন একটি মৈত্রীচুক্তির মধ্যে শরীক ছিলাম যে এর বিনিময়ে আমি লাল উটও গ্রহণ করা পছন্দ করতাম না। যদি ইসলাম আসার পরেও এমন কোনো চুক্তিতে আমাকে ডাকা হতো তবে আমি সে ডাকে সাড়া দিতাম'। **(ইবনে হিশাম ১/১৫৪,১৫৫)** - আর রাহীকুল মাখতূম, পৃ- **১০৬**(দারুল হুদা কুতুব খানা)

মক্কায় যখন কাবা ঘর নির্মান শেষ পর্যায়ে তখন বিপত্তি বাজে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে।
“হাজরে আসওয়াদ**”** তো যেই সেই পাথর নয়।

মহা সম্মানিত এক পাথর যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে।যার ফলে এর স্থাপনের মর্যাদা নিতে চায় সব গোত্র।ফলে কোনো সুরাহা ই হচ্ছিল না।কোন গোত্র পাবে এই মর্যাদা! এই চিন্তায় সকলেই যখন মগ্ন, তখন একজন বলে উঠলো- " আগামীকাল মজিদে হারামের ফটক দিয়ে যে ব্যাক্তি প্রথম প্রবেশ করবে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। দেখা গেল পরদিন রাসুলুল্লাহ সাঃ ই প্রথম প্রবেশ করলেন। ফলে সবাই বলে উঠলো "আল আমিন " এসেছেন। অতএব তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে কারো কোনো আপত্তি নেই।

রাসুলুল্লাহ সাঃ ও ছিলেন ন্যায়ের অনন্য দৃষ্টান্ত।

সেই মত বিরোধ কারীদের মাঝে নিজের গোত্র থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বজন প্রীতি দেখান নি।বরং একটা চাদরে হাজরে আসওয়াদ রেখে তার চার প্রান্তে চার গোত্রের নেতাকে ধরে নিয়ে যেতে বললেন কাবার কাছে। যা কুরাইশ নেতা গণ একবাক্যে মেনে নিয়েছিলেন।

ইনসাফের কাছে রাসুলুল্লাহ সাঃ নিজের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস টির ও পরোয়া করতেন না।সাহাবাগণের মাঝে ইনসাফের বীজ বপণ করার জন্য একদা রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছিলেন, 'বনি ইসরাঈল তাদের গণ্যমান্য পরিবারের কেউ চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিত। এবং দুর্বল কেউ চুরি করলে তারা তার হাত কেটে দিত। আল্লাহর শপথ, ফাতিমা (রা.) (যদি চুরি করে) আমি তার হাত কেটে ফেলব।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৭৩৩)

দয়াঃ

ইসলাম দয়া ও সহানুভূতির ধর্ম।

দয়ার এক উত্তম দৃষ্টান্ত হিসেবেই এই ধরণীর বুকে আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়েছেন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি বিশ্বজগতের জন্য রহমতরূপে।" (সূরা আম্বিয়া 21:107)

আর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সম্পূর্ণ জীবন জুড়েই আছে দয়ার প্রতিফলন।

মহানবী (সা.) বলেছেন,

"দুনিয়াবাসীর প্রতি দয়া করো, আসমানের মালিক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" (তিরমিজি) এখানে দুনিয়াবাসী দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাঃ রব্বে কাবার সমস্ত সৃষ্টিকে বুঝিয়েছেন।যা মুসলিম থেকে অমুসলিম, মানুষ থেকে প্রাণী, জীব থেকে জড় সবকিছুর মাঝে বিস্তত।

অমুসলিমদের প্রতি দয়া

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ইহুদি নবী (সা.)-এর খেদমত করত। সে অসুস্থ হলে নবী (সা.) তাকে দেখতে গেলেন। তার মাথার দিকে বসে নবীজি বলেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। তখন সে তার পিতার দিকে তাকাল। পিতা বলেন, তুমি আবুল কাসেমের (নবীর) অনুসরণ করো। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন নবী (সা.) এই বলে বের হলেন, 'আল্লাহর শুকরিয়া, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।' (বুখারি, হাদিস : ১২৯০)

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, 'একদা এক বেদুঈন মসজিদে প্রস্রাব করলো। লোকেরা উঠে (তাকে মারার জন্য) তার দিকে গেল। মহানবী (সা.) বললেন, তার প্রস্রাব বন্ধ করো না। তারপর তিনি (সা.) এক বালাতি পানি আনলেন এবং পানি প্রস্রাবের ওপর ঢেলে দেয়া হল।' (সহীহ বোখারী, কিতাবুল আদব)।

কণ্যা সন্তানের প্রতি দয়া

জাহেলিয়াতের অন্ধকার যুগে কণ্যা সন্তানকে যখন জীবিত কবর দেওয়া হতো তখন ইসলাম আসে হেদায়েতের আলো নিয়ে।

আল্লাহ বলেছেন,

"এবং যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে দুঃখিত হয়ে পড়ে। তাকে যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, তার দুঃখে সে মানুষের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে রেখে দেবে, নাকি তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে? শুনে রাখো, তাদের ফায়সালা অত্যন্ত নিকৃষ্ট।"

[সুরা আন-নাহল, আয়াত ৫৮-৫৯]

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন,

"যে ব্যক্তি দুটি অথবা তিনটি কন্যা, কিংবা দুটি অথবা তিনটি বোন তাদের মৃত্যু অথবা বিবাহ, অথবা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত, কিংবা ঐ ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত যথার্থ প্রতিপালন করে, সে ব্যক্তি আর আমি (পরকালে) তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়ের মত পাশাপাশি অবস্থান করব।" (আহমাদ ৩/১৪৭-১৪৮, ইবনে হিব্বান ২০৪৫ নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৯৬ নং)

ইয়াতীমদের প্রতি দয়াঃ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢) سورة النساء

অর্থাৎ, পিতৃহীনদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ কর এবং উৎকৃষ্টের সাথে নিকৃষ্ট বদল করো না এবং তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদকে মিশ্রিত ক'রে গ্রাস করো না; নিশ্চয় তা মহাপাপ। (নিসা: ২)

প্রাণীর প্রতি দয়াঃ

মহানবী স. বলেছেন:

عذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْض..)

"এক মহিলাকে একটি বিড়ালের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সে তাকে বেঁধে রেখেছিল এবং অবশেষে সে মারা গিয়েছিল, পরিণতিতে মহিলা তারই কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করল। সে

যখন তাকে বেঁধে রেখেছিল, তখন তাকে আহার ও পানি দিত না এবং তাকে ছেড়েও দিত না যে, সে কীট-পতঙ্গ ধরে খাবে।” (বুখারী ও মুসলিম)

একদা মহানবী একটি উটকে দেখলেন, (ক্ষুধায়) তার পিঠের সাথে পেট লেগে গেছে। তা দেখে তিনি বললেন, "তোমরা এই অবলা জন্তদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। সুতরাং উত্তমভাবে (সুস্থ থাকা অবস্থায়) তাতে সওয়ার হও এবং উত্তমভাবে (সুস্থ থাকা অবস্থায়) তা খাও (বা তার পিঠ থেকে নেমে যাও)।” (আবু দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ২২৭৩নং)।

নবীজী আরো বলেন, "যে কোন মুসলিম গাছ লাগায় কিংবা কোন ফসল ফলায় আর তা হতে কোন পাখী, মানুষ অথবা চতুষ্পদ জন্ত ভক্ষণ করে, তবে তা তার জন্য সদকাহ (করার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ) হয়।” (বুখারী ২৩২০নং)।

ক্ষমাশীলতাঃ

যেখানে প্রতিশোধ জ্বালায় হৃদয়কে, সেখানে ক্ষমা ছড়িয়ে দেয় শান্তির সুবাস।

ক্ষমা, এটা এমন এক মানব গুণ যেখানে রাগের জায়গায় দয়া, আর ঘৃণার জায়গায় ভালোবাসা ফুটে ওঠে।ইসলাম এই ক্ষমাশীলতাকেই করেছে চরিত্রের অলঙ্কার, বিশ্বাসের গভীর সৌন্দর্য। কুরআনে আল্লাহ বলেন

“তোমরা মন্দের জবাবে উত্তম আচরণ করো; দেখবে, শত্রুও ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে যাবে।” (সূরা ফুসসিলাত, আয়াত ৩৪)

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣) سورة الزمر

অর্থাৎ, ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার দাসগণ!

তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, তারা আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ো না: নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ মাফ ক'রে দেবেন। নিশ্চয় তিনিই চরম ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু।(যুমার : ৫৩)

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
(٧٠) سورة الفرقان

অর্থাৎ, তবে যারা তওবা করে, বিশ্বাস ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের পাপকর্মগুলিকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেবেন। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (ফুরক্বান: ৭০)

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনে কুরআনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ছিলেন।

তাঁর দিকে পাথর ছোঁড়া হয়েছে, অপমান করা হয়েছে, কিন্তু তাঁর মুখে একটিও অভিশাপ আসেনি, বরং এসেছে দোয়া,

“হে আল্লাহ, তাদের ক্ষমা করো; তারা জানে না তারা কী করছে।”

তায়েফের ঘটনাঃ

ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীতে উরওয়া বিন যুবাইর এর সূত্রে রেওয়ায়েত করেন, আয়েশা রা. তাকে বলেছেন যে, তিনি একবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলেন, উহুদ যুদ্ধের দিনের চেয়েও কোনো কঠিন দিন কি জীবনে কখনো আপনার ওপর দিয়ে গেছে? তিনি জবাবে বললেন,

তোমার কওমের কাছ থেকে আমি যা পাওয়ার তা তো পেয়েছিই। কিন্তু তার চেয়েও আমার জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা হাসিল হয়েছে আক্বাবার দিন। যে দিন আমি আবদে কুলালের ছেলে আবদে ইয়ালীলের কাছে নিজেকে পেশ করেছিলাম। কিন্তু সে আমার ডাকে সাড়া দেয়নি। তখন আমি চিন্তা ও পেরেশানির চোটে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলাম। অনন্তর দীর্ঘ সময় পরে করনুল মানাযিলে আমি আমার নিজেকে আবিষ্কার করলাম। আমি মাথা উঠিয়ে দেখতে পেলাম একখণ্ড মেঘ তার স্নেহের আঁচলে জড়িয়ে ধরে আমাকে ছায়া দিয়ে যাচ্ছে। ভালোভাবে তাকিয়ে দেখলাম জিবরাঈল আ. দাঁড়িয়ে। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনার কওম আপনাকে কী জবাব দিয়েছে আল্লাহ তা সবকিছু শুনেছেন। এ কারণে আল্লাহ পাক আপনার কাছে পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন আপনি যা মন চায় তাই করতে পারেন। পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডেকে সালাম দিলেন। এরপরে বললেন, মুহাম্মাদ! আপনার যা ইচ্ছা আপনি তাই নির্দেশ দিন। আপনি যদি চান তবে আমি তাদেরকে আবু কুবাইস কুআইকিয়ানকে একসঙ্গে চাপা দিয়ে শেষ করে দিবো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, না! তাদেরকে মারবেন না।আমার একান্ত আশা; হয়তো আল্লাহ পাক তাদের বংশধরদের মধ্যে এমন অগণিত অসংখ্য মানুষ পাঠাবেন যারা একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে। যারা তাঁর সঙ্গে কোনো কিছু শরীক করবে না। (সহীহ বুখারি: সৃষ্টির সূচনা অধ্যায়, হাদীস নং ৩২৩১,৭৩৮৯। ফাতহুল বারী ৬/৩৬০,মুসলিম ২/১০৯)

পাহাড়ের ফেরেশতার প্রশ্নের জবাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই উত্তর শুনলেই বোঝা যায় কতটা বিশাল ও অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন নবীজী আমার!

তাঁর আখলাক-চরিত্র ছিল কতটা মহান! এমন এক গভীর দরিয়া যার কূল-কিনারা ও গভীরতা দুনিয়ার কোনো মানুষের পক্ষে তলিয়ে দেখা সম্ভব নয়।
- আর রাহীকুল মাখতূম, পৃ-২৩২(দারুল হুদা কুতুব খানা)

মক্কা বিজয়
ইসলামের প্রথম যুগে রাসুলুল্লাহ সাঃ যখন ইসলাম প্রচার করতেন তখন মক্কাবাসী রাসুলুল্লাহ সাঃ কে অনেকভাবে কষ্ট দিয়েছিল।তারা কখনো সেজদার মধ্যে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর উপর উটের নারী ভুরী চাপিয়ে দিয়েছে। কখনো রাসুলুল্লাহ কে যাদুকর উপাধি দিয়েছে। তাঁর প্রাণপ্রিয় চাচা হযরত হামযাহ রাঃ কে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করেছে।হিন্দা সেই মরদেহ চিড়ে কলিজা বের করে চিবিয়েছে।তাঁর চাচার দেহকে এমনভাবে বিকৃত করা হয়েছিল যে তা চরম নিষ্ঠুরতা কে ও হার মানায়।

একে একে যখন হযরত খাদিজা রাঃ, তাঁর চাচা আবু তালিব পরোলোক গমন করেন যারা মক্কার বুকে ছিলেন ছাউনির মতো তখন মক্কার কুরাইশ রা রাসুলুল্লাহ সাঃ কে তাঁর স্বদেশ মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিলো।

ইসলামের ইতিহাসে মক্কা বিজয়ের ঘটনা এমন একটি ঘটনা, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দ্বীন এবং তাঁর রসূলকে শক্তিশালী করেছেন।ক্ষমার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন।

অষ্টম হিজরীর রমযান মাসের দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর নাবী (ﷺ) ১০ হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলেন। বের হওয়ার সময় আবু রুহম কুলছুম বিন হুসাইনকে মদ্বীনার খলীফা নির্বাচন করলেন। মক্কা আক্রমণ ও জয় করার কারণ হচ্ছে, কুরাইশরা হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং খোযাআ গোত্রের উপর রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করে তাদেরকে অকাতরে হত্যা করেছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত মোতাবেক খোযাআ গোত্র রসূল (ﷺ) এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। এটি ছিল হুদায়বিয়ার সন্ধির সুস্পষ্ট লংঘন।
ইসলামী বাহিনী যখন 'মাররুয যাহরান' নামক স্থানে পৌঁছল তখন রাতের বেলা নবী (ﷺ) সাহাবীদেরকে আগুন জলানোর আদেশ দিলেন। সাহাবী প্রজ্জলিত আগুনের আলোতে আশে-পাশের সমস্ত অঞ্চল আলোকিত হয়ে গেল। তখনো মক্কাবাসীদের কাছে মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের কোন খবর ছিলনা। তবে তাদের অন্তরে আশঙ্কা ছিল যে, যে কোন সময় মুসলিম বাহিনী মক্কায় আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তারা চলে আসবে- এটি তাদের

ধারণায় ছিলনা। অতঃপর নাবী (ﷺ) মুজাহিদ বাহিনীকে সাথে নিয়ে বিনা বাধায় মক্কায় প্রবেশ করলেন। প্রথমে তিনি কাবা ঘরের দিকে গেলেন। তাঁর চার পাশে আনসার ও মুহাজিরগণ ঘিরে ছিল। কাবায় গিয়ে তিনি আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করলেন। রসূল ((ﷺ-এর হাতে একটি ধনুক ছিল। সে সময় কাবার অভ্যন্তরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। ধনুকের মাধ্যমে এক এক করে তিনি মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেললেন। এ সময় তিনি কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করছিলেন-

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

''বলঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল''।
[সূরা বনী ইসরাঈল: ৮১]

অতঃপর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কাবার ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং সলাত পড়লেন। সলাত পড়ে বাইরে আসলেন। কুরাইশরা তখন সারিবদ্ধভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে অবস্থান করছিল।
অতঃপর তিনি বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমাদের সঙ্গে আমার আজকের আচরণ সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা?
তারা বলল, ভালো। আপনি সুমহান ভাই! সুমহান ভাইয়ের সন্তান!!
তিনি বললেন, তবে আজ আমি তোমাদেরকে সে কথাই বলব আল্লাহর নবী ইউসুফ আ. আপন ভাইদের উদ্দেশে যা বলেছিলেন,

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْم َ

তথা আজ তোমাদের ওপর কোনো নিন্দা-ভর্ৎসনা নেই। যাও তোমরা সবাই আযাদ ও মুক্ত!

অধ্যায় তিন

অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলামের সৌন্দর্য

হিন্দু ধর্মের তুলনায় ইসলামের সৌন্দর্যঃ

ধর্ম মানুষের হৃদয়ের এক গভীর আলো, যা তাকে নৈতিকতা, ন্যায়, ও শান্তির পথে পরিচালিত করে।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে বহু ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে, কিন্তু প্রতিটি ধর্মই মানুষকে কল্যাণ, দয়া ও আত্মশুদ্ধির শিক্ষা দিয়েছে।

তবে সকল ধর্মের মধ্যেই ইসলাম এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা কেবল উপাসনা নয়, বরং মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও সৌন্দর্যের পথ প্রদর্শন করে।

হিন্দুধর্ম দক্ষিণ এশিয়ার প্রাচীনতম ধর্মগুলোর একটি। এটি আচার-অনুষ্ঠান, দর্শন, ও বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার মাধ্যমে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি প্রকাশ করে।

তবে ইসলামের বিশেষত্ব হলো এর তাওহীদের শুদ্ধতা, সমতার শিক্ষা, ও যুক্তিনির্ভর ঈমান, যা কেবল বিশ্বাস নয়, বরং মানবতার উপর প্রতিষ্ঠিত এক বাস্তব জীবনধারা।

ইসলাম এবং হিন্দুধর্ম, দুই ধর্মই মানুষকে সৎ, দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ হতে আহ্বান জানায়। কিন্তু ইসলামের সৌন্দর্য এখানেই যে, এটি জীবনের প্রতিটি দিককে এক আল্লাহর নির্দেশে একত্রিত করেছে,যেখানে বিশ্বাস, বিজ্ঞান, ও নৈতিকতা এক অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বাঁধা।

ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মৌলিক ভিত্তি

ইসলাম:

ইসলাম শব্দের অর্থ “শান্তি” ও “আত্মসমর্পণ”। যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশে আত্মসমর্পণ করে ও তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন করে,

সে-ই মুসলিম। ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভঃ শাহাদাত, সালাত, সাওম, যাকাত, ও হজ। এই পাঁচটি স্তম্ভ শুধু ইবাদত নয়, এগুলো মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ, ন্যায্য, ও মানবিক জীবনের প্রশিক্ষণ দেয়।

হিন্দুধর্ম:

হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি হলো “ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ” — এ চারটি পুরুষার্থ বা জীবনের উদ্দেশ্য। এখানে মানুষকে নৈতিকতা, কর্মফল ও পুনর্জন্মের বিশ্বাসে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে আহ্বান জানানো হয়। বেদ, উপনিষদ, গীতা ও পুরাণ— এসব গ্রন্থ এর দর্শনের উৎস।

তবে ধর্মীয় ধারণাগুলো একক নয়; এখানে বহু দেবতা, আচার ও মতবাদের সহাবস্থান রয়েছে।

হিন্দু ধর্মের সাথে তুলনা:

১.তাওহীদ বনাম বহু-দেবতা বিশ্বাস

হিন্দুধর্মে:

হিন্দুধর্মে বহু দেব-দেবীর পূজার প্রচলন রয়েছে। যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী, দুর্গা ইত্যাদি। তারা সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব বহন করেন বলে বিশ্বাস করা হয়।এই বহুদেববাদ কখনো কখনো মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেঃ কে সৃষ্টিকর্তা, কে পালনকর্তা, কে বিচারক, এসব প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট নয়।

ইসলামে:

ইসলাম এক আল্লাহর তাওহীদের শিক্ষা দেয়— যিনি একক, অদ্বিতীয়, অনন্ত ও সর্বশক্তিমান। আল্লাহ বলেন:

“বল, তিনি আল্লাহ এক; আল্লাহ অমুখাপেক্ষী; তিনি জন্ম দেননি ও জন্মগ্রহণও করেননি; এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।” — (সূরা ইখলাস ১–৪)

এই তাওহীদ আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির মাঝে মানুষকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়। সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষকে এক আল্লাহর দাসত্বে নিয়ে আসে।মানুষকে শিক্ষা দেয়, এক আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথা নত করা যাবে না।যা মানুষের মানবিক গুনাবলিকে উন্নত করে।
তাওহীদ মানুষকে মানসিক শান্তি দেয়। কারণ সে জানে তার প্রভু এক, যাঁর কাছে সে সাহায্য প্রার্থনা করবে,যেকোনো প্রেয়াজনে তাঁর কাছেই ছুটে যেতে হবে, এবং যাঁর কাছে সে জীবন শেষে ফিরে যাবে।

তাওহীদ একটি যৌক্তিক ধারণা—

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে সুশৃঙ্খলতা ও নিয়ম দেখা যায়, তা এক পরিচালকের অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়। যদি বহু সৃষ্টিকর্তা থাকতো, তবে সৃষ্টি ও বিধান একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়াতো,

যেমন কুরআনে বলা হয়েছে:
“যদি আকাশ ও পৃথিবীতে একাধিক উপাস্য থাকতো, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।”
— (সূরা আনবিয়া ২১:২২)

২.জীবনদর্শনে বাস্তবতা ও সামঞ্জস্য

হিন্দুধর্মে:

জীবনের লক্ষ্য হিসেবে “মোক্ষ” বা পুনর্জন্ম থেকে মুক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কর্মফল অনুযায়ী মানুষ বারবার জন্মগ্রহণ করে—
এই ধারণা মানসিকভাবে এক অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে, কারণ কেউ জানে না তার পরের জন্ম কেমন হবে।

ইসলামে:

ইসলাম বলে জীবন একবারই, এবং এর পরে বিচার দিবস। মানুষের প্রতিটি কাজের ফল আল্লাহ ন্যায়বিচারের মাধ্যমে প্রদান করবেন।
এতে মানুষ দায়িত্বশীল হয়, কারণ সে জানে, তার প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে। ইসলামের এই ধারণা মানুষকে বাস্তব জীবনে নৈতিক, সময়নিষ্ঠ ও মানবিক হতে শেখায়।

৩. সামাজিক সাম্য ও মানবাধিকার

হিন্দুধর্মে:

বর্ণব্যবস্থা (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। নিম্নবর্ণের মানুষ বহু যুগ ধরে অবহেলিত ও অধিকারবঞ্চিত।

ইসলামে:

ইসলাম ঘোষণা দেয়: “নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই-ই সম্মানিত, যে সবচেয়ে পরহেজগার।”

আল্লাহ বলেন-
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُون{ َ

অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (ধর্ম বা কুরআন)কে শক্ত ক'রে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর; তোমরা পরস্পর শত্রু

ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করলেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের (দোযখের) প্রান্তে ছিলে, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তা হতে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার। (আলে ইমরানঃ ১০৩)

তিনি আরো বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذكر وأنثى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (١٣) الحجرات

অর্থাৎ, হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরেরর সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক আল্লাহ-ভীরু। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।(হুজুরাত ১৩)

রাসুলুল্লাহ সাঃ এর জীবনী পুরোটাই যেন কুরআনের প্রতিচ্ছবি।

একদা হযরত মুহাম্মাদ স. মসজিদ প্রাংগণে কুরাইশদের বড় বড় নেতা দের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। তার মাঝে এক অন্ধ লোক এসে রসুলল্লাহ’র স. এর কাছে কিছু শুনতে চাইলে রসুলল্লাহ সামান্য ভ্রু কুঞ্চিত করেন।

তখন আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাজিল করেন এই ঘটনার প্রেক্ষিতে।

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكَى (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤) أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (٧) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ} (١٢(

অর্থাৎ, সে ভ্রূ কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। যেহেতু তার নিকট অন্ধ লোকটি আগমন করেছিল। তোমাকে কিসে জানাবে? হয়তো বা সে পরিশুদ্ধ হত। অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে তা তার উপকারে আসত। পক্ষান্তরে যে লোক বেপরোয়া, তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিলে। অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দোষ নেই। পক্ষান্তরে যে তোমার নিকট ছুটে এল, সভয় মনে, তুমি তার প্রতি বিমুখ হলে! কক্ষনো (এরূপ করবে) না। এটা তো উপদেশবাণী; যে ইচ্ছা করবে সে তা স্মরণ রাখবে (ও উপদেশ গ্রহণ করবে)। (আবাসাঃ ১১২)

ইসলাম বিশ্ব উম্মাহ কে এক উম্মাহ হিসেবে শিক্ষা দেয়। প্রত্যেক মুসলিম একে অপরের ভাই।

উদাহরণ হিসেবে দেয়,একটা দেহের মতো।দেহে যেমন এক অংগ ব্যথা পেলে সমস্ত শরীর কুকড়ে উঠে।পুরো উম্মাহর কোথাও যদি কষ্টে থাকে তাহলে পুরো বিশ্বের উম্মাহর মাঝে যেনো ঝড় উঠে যায় ইসলাম এমন টা শিখায়।

তাঁর প্রেরিত দূত বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের দেহ এবং তোমাদের আকৃতি দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।" (মুসলিম)

"কিয়ামতের দিন মোটা-তাজা বৃহৎ মানুষ আসবে, আল্লাহর কাছে তার মাছির ডানার সমানও ওজন হবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

মহানবী বলেছেন, "তোমরা এক অপরের প্রতি হিংসা করো না, কেনা-বেচাতে জিনিসের মূল্য বাড়িয়ে এক অপরকে ধোঁকা দিয়ো না, এক অপরের প্রতি শত্রুতা রেখো না, এক অপর থেকে (ঘৃণাভরে) মুখ ফিরায়ো না এবং এক অপরের (জিনিস) কেনা-বেচার উপর কেনা-বেচা করো না। আর হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ভাই-ভাই হয়ে যাও। মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না, তাকে তুচ্ছ ভাববে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে। (তিনি নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করে এ কথা তিনবার বললেন।) কোন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাবা একটি মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, মাল এবং তার মর্যাদা অপর মুসলিমের উপর হারাম।" (মুসলিম)

তিনি আরো বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ (পূর্ণ) মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

রাসুলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজে ঘোষণা করেন:

"আরবীর উপর অনারবীর এবং অনারবীর উপর আরবীর, কৃষ্ণকায়ের উপর শ্বেতকায়ের এবং শ্বেতকায়ের উপর কৃষ্ণকায়ের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল তাক্বওয়ার কারণেই।" (মুসনাদে আহমাদ ৫/৪১১)

ইসলামের এই সাম্যের ধারণা মানবতার পরিপূর্ণ উদাহরণ। এখানে জাতি, বর্ণ বা অবস্থান নয়, শুধু চরিত্র ও ন্যায়ের ওপর মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয়।আল্লাহর কাছে সেই বান্দাই উত্তম, হৃদয়ের মাঝে তাকওয়ায়ে যে উত্তম।

৪.নারীর মর্যাদা

হিন্দুধর্মে:

প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে নারীদের অধীনস্ত ভূমিকা দেখা যায়। যেমন "মনুস্মৃতি"-তে বলা হয়েছে: "নারী কখনো স্বাধীন হতে পারে না; শৈশবে পিতার, যৌবনে স্বামীর, বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকবে।"

ইসলামে:

ইসলাম নারীর সম্মান ও স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করেছে।

কুরআনে বলা হয়েছে:

"আমি তোমাদের একে অপরের থেকে সৃষ্টি করেছি।" — (সূরা নিসা ৪:১)

নারীকে উত্তরাধিকার, শিক্ষা, ব্যবসা ও সামাজিক অংশগ্রহণের অধিকার দিয়েছে ইসলাম, যা সপ্তম শতাব্দীতে বিপ্লবী ঘোষণা ছিল। ইসলাম নারীর মর্যাদাকে মানব মর্যাদার সমান স্থানে উন্নীত করেছে, যেখানে হিন্দুধর্মে তা প্রথাগত রীতিতে সীমাবদ্ধ ছিল

৫.বিজ্ঞান ও যুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য

হিন্দুধর্মে:

বেদ ও পুরাণে বহু কাব্যিক ও রূপক বর্ণনা রয়েছে, যা অনেক সময় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন।

ইসলামে:

কুরআন মানুষকে জ্ঞান অন্বেষণে উৎসাহিত করে:

"বলঃ যারা জানে এবং যারা জানেনা তারা কি সমান?" — (সূরা যুমার ৩৯:৯)

"তিনি মানুষকে এমন কিছু শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।" — (সূরা আলাক ৯৬:৫)

আধুনিক বিজ্ঞানের বহু আবিষ্কার (ভ্রূণের বিকাশ, মহাবিশ্বের প্রসারণ, পর্বতের স্থিতি ইত্যাদি) কুরআনের আয়াতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে।

خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۡہَا زَوۡجَہَا وَ اَنۡزَلَ لَکُمۡ مِّنَ الۡاَنۡعَامِ ثَمٰنِیَۃَ اَزۡوَاجٍ ؕ یَخۡلُقُکُمۡ فِیۡ بُطُوۡنِ اُمَّہٰتِکُمۡ خَلۡقًا مِّنۡۢ بَعۡدِ خَلۡقٍ فِیۡ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ ذٰلِکُمُ اللّٰہُ رَبُّکُمۡ لَہُ الۡمُلۡکُ ؕ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ۚ فَاَنّٰی تُصۡرَفُوۡنَ ﴿۶﴾

তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে। অতঃপর তিনি তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের দিয়েছেন আট প্রকার গৃহপালিত পশু। তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ! তোমাদের রাব্ব। সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ?
(সূরা যুমার:৬)

ইসলাম শুধু ধর্ম নয়, এটি এক বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসিদ্ধ জীবনব্যবস্থা। ইসলাম এমন এক ধর্ম যা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে আলোকিত করেছে।
এটি কেবল কিছু আচার-অনুষ্ঠানের নাম নয়, বরং এটি এক সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা (Complete Code of Life)। ইসলামের সৌন্দর্য নিহিত আছে এর সাম্য, ন্যায়, দয়া, ক্ষমা, জ্ঞান ও শৃঙ্খলায়।

ইসলামের শিক্ষা মানুষকে এমন পথে পরিচালিত করে, যেখানে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পাশাপাশি সমাজেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন মুসলমানের প্রতিটি কাজ, চিন্তা, কথা, আচরণ সব কিছুতেই পরিলক্ষিত হয় আল্লাহভীতির ছাপ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
"সর্বোত্তম মানুষ সে, যে অন্যদের জন্য সর্বাধিক উপকার বয়ে আনে।" — (আল-মু'জাম আল-আওসাত, হাদিস ৬১৯২)

এই হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়,
ইসলাম কেবল ইবাদতের ধর্ম নয়, বরং মানবতার ধর্ম।

ইসলামী নৈতিকতার সৌন্দর্য

ইসলামী নৈতিকতা বা akhlaq হচ্ছে ইসলামের প্রাণ। এতে রয়েছে ইনসাফ (ন্যায়বিচার), রহমত (দয়া), হিলম (সহনশীলতা) এবং ইখলাস (বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য) রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজে ছিলেন নৈতিকতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

যেমন কুরআনে বলা হয়েছে:
"নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী।" — (সূরা কলম ৬৮:৪)

এই চরিত্রই ইসলামকে বিশ্বজুড়ে আকর্ষণীয় করেছে। তাওহীদের শক্তি যেমন মানুষের অন্তরে ঐক্য আনে, তেমনি নৈতিকতার আলো সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

বিজ্ঞান ও যুক্তির দৃষ্টিতে ইসলামের সৌন্দর্য

ইসলাম জ্ঞানের প্রতি অনন্য গুরুত্ব দিয়েছে, যা অন্য অনেক ধর্মে কেবল আধ্যাত্মিকতার সীমায় আবদ্ধ। ইসলাম বলে:
"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ।" — (ইবন মাজাহ, হাদিস ২২৪)

এই নির্দেশনা থেকেই মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগে জন্ম নিয়েছিল ইবন সিনা, ইবন রুশদ, আল-বিরুনি, আল-খওয়ারিজমির মতো বিজ্ঞানীরা, যারা আধুনিক বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেন।

মেডিকেল সায়েন্সেও দেখা যায়, ইসলামী বিধান যেমন নামায, রোযা, ওযু, তাহারাত ইত্যাদি স্বাস্থ্য, রক্তচাপ, মানসিক স্থিতি ও রোগপ্রতিরোধে আশ্চর্য উপকার বয়ে আনে। এগুলো প্রমাণ করে যে ইসলাম শরীর ও আত্মার উভয় কল্যাণের ধর্ম।

ইসলামের সৌন্দর্য এমন এক আলোকধারা, যা কেবল ধর্মীয় নয়, বরং মানবতার সর্বাঙ্গীন বিকাশের পথপ্রদর্শক। এটি মানুষকে শিক্ষা দেয় শান্তি, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায় ও দয়ার মধ্যে জীবনযাপন করতে।

হিন্দুধর্মসহ অন্য ধর্মগুলো নৈতিকতার কথা বললেও, ইসলাম সেই নৈতিকতাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগের পূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছে।

তাই বলা যায়, ইসলাম শুধু আখলাকের শিক্ষা দেয় না, বরং সেটিকে সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিটি পদক্ষেপ নির্ধারণ করে দিয়েছে।

যেমন রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
“আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য।” — (আল-মুয়াত্তা, হাদিস ১৬১৪)
এই হাদিসেই নিহিত ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য, যেখানে মানুষের আত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক সব দিকেই পরিপূর্ণতা পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্রঃ

1. Al-Qur’an, Surah Al-Ikhlas (112:1–4); Surah Al-Hujurat (49:13); Surah Al-Qalam (68:4).
2. Ibn Majah. Sunan Ibn Majah, Hadith no. 224.
3. Malik M. Al-Muwatta, Hadith no. 1614.
4. Al-Mu‘jam Al-Awsat, Hadith no. 6192.
5. Ahmed Z. Islamic Concept of Justice and Equality. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh; 2018.
6. Rahman M. Comparative Religion: Islam and Hinduism. Dhaka University Journal of Islamic Studies. 2019; Vol. 45(2): 55–68.
7. Nasr SH. Science and Civilization in Islam. Harvard University Press; 1987.
8. Hossain M. Islamic Ethics and Modern Science. Bangladesh Islamic Research Council; 2021.

ইহুদি ধর্মের তুলনায় ইসলামের সৌন্দর্য

মানব ইতিহাসে ইসলাম ও ইহুদি ধর্ম, দুই মহান নবীদের শিক্ষা থেকে উদ্ভূত ধর্ম। উভয়ের শিকড় এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সময়ের প্রবাহে ইহুদি ধর্মের কিছু শিক্ষা হারিয়েছে তার বিশুদ্ধতা, আর ইসলাম এসে সেই তাওহীদের শুদ্ধ ও পূর্ণ রূপ প্রতিষ্ঠা করেছে। ইহুদি ধর্ম সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল এক জাতির ধর্মে, কিন্তু ইসলাম বিস্তৃত হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য। এই সার্বজনীনতাই ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য।

১. তাওহীদের বিশুদ্ধতা ও পূর্ণতা

ইহুদি ধর্মে:

ইহুদি ধর্মে “এক আল্লাহ”-এর প্রতি বিশ্বাস থাকলেও, তাদের ঈশ্বর ধারণা সময়ের সঙ্গে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় ‘God of Israel’-এ, অর্থাৎ, কেবল ইহুদি জাতির উপাস্য।

ইসলাম ঘোষণা করেঃ

“সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল জগতের রব।” — (সূরা ফাতিহা **১**:২)

অর্থাৎ, আল্লাহ কেবল এক জাতির নয়, বরং সমগ্র সৃষ্টির প্রভু। এটাই ইসলামের তাওহীদের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য যে কত্বের পাশাপাশি সার্বজনীনতা। ইসলামের এই সার্বজনীন তাওহীদ মানুষকে বিভেদমুক্ত করে, যেখানে ইহুদি ধর্ম জাতিগত সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ।

২. নবুওয়াত ও চূড়ান্ততার সৌন্দর্য

ইহুদি ধর্ম পালনকারীরা বহু নবীকে মানে, কিন্তু শেষ নবীকে অস্বীকার করে। অথচ শেষ নবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের অংশ।

তারা বিশ্বাস করে যে নবুওয়াত শুধুমাত্র ইসরায়েলি জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

আল্লাহ্ বলেন “আমি তোমার পূর্বে অনেক রসূল পাঠিয়েছি, এবং তোমার পরে কোনো রসূল আসবে না।” — (সূরা আহযাব ৩৩:৪০)

অর্থাৎ, রাসুলুল্লাহ ﷺ হলেন সর্বশেষ নবী,

এবং তাঁর বার্তা সব জাতি ও সকল যুগের জন্য । ইসলামে ধর্মীয় বার্তা পূর্ণতা পেয়েছে। যেখানে ইহুদি ধর্ম এক জাতির মাঝে সীমিত, ইসলাম সবার জন্য উন্মুক্ত।

৩. ইবাদত ও জীবনব্যবস্থার বাস্তবতা

ইহুদি ধর্মে:

ইবাদত অনেক সময় আচারনির্ভর ও প্রতীকী। তাদের প্রার্থনা ও রীতিনীতির বেশিরভাগই মন্দির বা সিনাগগকেন্দ্রিক। দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় সচেতনতা তুলনামূলক কম।

ইসলাম ইবাদতকে জীবনের প্রতিটি স্তরে বাস্তবায়িত করেছে।
নামায, রোযা, যাকাত, হজ; এগুলো শুধু আচার নয়, বরং আত্মশুদ্ধি, শৃঙ্খলা ও সমাজকল্যাণের প্রতীক।ইসলামের ইবাদত আত্মার সঙ্গে সমাজকেও নির্মাণ করে।
যেমন নামায মানুষকে সময়ানুবর্তী ও শান্ত করে, রোযা আত্মসংযম শেখায়, যাকাত ধনী গরিবের মাঝে প্রতিষ্ঠা করে।

৪.ন্যায়বিচার ও মানবতার পরিধি

ইহুদিদের আইন কেবল ইহুদিদের জন্য প্রযোজ্য। অন্য জাতির প্রতি তাদের সামাজিক দায় সীমিত।

ইসলাম মানবতার প্রতি সার্বজনীন ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র প্রাণও ইসলামের কাছে অমূল্য সম্পদ। কুরআনে বর্ণিত একটি ঘটনা থেকে আরো ভালো বুঝা যায়,
একদিন সুলাইমান আঃ বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে এক পথে যাচ্ছিলেন, তখন তারা একটি পিঁপড়াদের উপত্যকায় পৌঁছান। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,
আর যখন তারা পিঁপড়াদের উপত্যকায় পৌছিয়েছিল, একটি পিঁপড়া(স্ত্রী) বলেছিল, “হে পিঁপড়ারা, তোমাদের ঘরগুলোতে প্রবেশ কর, যাতে করে সুলায়মান এবং তার বাহিনী তোমাদেরকে না বুঝে পিষে না ফেলে”। (২৭:১৮)
সুলাইমান (আ.) পিপড়ার ভাষা বুঝতেন।
এই ঘটনা শুনে তিনি মুচকি হাসেন এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন যেন তিনি তাকে তার প্রতি এবং তার পিতা-মাতার প্রতি করা অনুগ্রহের জন্য শুকরিয়া আদায় করার তৌফিক দেন এবং তাকে তার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

এটি কুরআন ও হাদিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত, যা ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রতিও সহানুভূতির শিক্ষা দেয়।
আল্লাহ বলেন,
“যে একটি প্রাণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, সে যেন পুরো মানবজাতিকে হত্যা করল।”
— (সূরা মায়িদা ৫:৩২)

এই আয়াতই প্রমাণ করে যে ইসলামে মানুষের মূল্য ধর্ম বা জাতির ওপর নয়, বরং তার মানবতার ওপর নির্ভরশীল।

৫.ধর্মীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা

ইহুদি ধর্মে:

তাদের ধর্মগ্রন্থ মূলত ঐতিহাসিক ও আইনভিত্তিক। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সেখানে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার অংশ নয়।

আর ইসলাম প্রথম থেকেই জ্ঞানকে ফরজ ঘোষণা করেছে। রাসুলুল্লাহ সাঃ এর কাছে প্রথম ওহি ছিল জ্ঞান সম্পর্কিত,
"পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন" (আলাক: ১)

কুরআনে ৭৫০টিরও বেশি আয়াত জ্ঞান ও সৃষ্টির চিন্তা নিয়ে।
মহান আল্লাহ তাঁর আসমানী কিতাবে শিখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে জ্ঞান প্রার্থনা করতে হবে তাঁর কাছে। তিনি বলেন,
"বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন" (ত্বা-হা: ১১৪)

তিনি আরো বলেন,
"বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?" (যুমার: ৯)

এই কারণেই মুসলিম সভ্যতা জন্ম দিয়েছে
বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ, চিকিৎসা, গণিত ও দর্শনের বিপ্লব। ইসলাম প্রমাণ করেছে যে ধর্ম ও বিজ্ঞান একে অপরের বিরোধী নয়।
ইহুদি ধর্ম একটি জাতিতে সীমাবদ্ধ হলেও, ইসলাম এসেছে সমগ্র মানবজাতির মুক্তির বার্তা নিয়ে।
আল্লাহ বলেছেন,

وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ اِلَّا رَحۡمَۃً لِّلۡعٰلَمِیۡنَ ۞

আমিতো তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি শুধু রাহমাত রূপেই প্রেরণ করেছি।
— (সূরা আম্বিয়া ২১:১০৭)

এই দয়ার দর্শন, ন্যায়ের আহ্বান, এবং বিজ্ঞান-ভিত্তিক যুক্তি, সব মিলিয়ে ইসলাম এমন এক পূর্ণাঙ্গ ধর্ম, যা শুধু মানুষের আত্মাকে নয়, তার সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতাকেও আলোকিত করে।

তথ্যসূত্রঃ

1. Al-Qur’an, Surah Al-Fatiha (1:2); Surah Al-Ahzab (33:40); Surah Al-Ma’idah (5:32); Surah Al-Anbiya (21:107),Surah An- Naml(27:18), Surah Alaq (1:1), Surah Zumar (39:9),Surah Ta- ha (20:114)

2. Ibn Kathir I. Tafsir al-Qur’an al-‘Azim. Beirut: Dar al-Ma’rifah; 2000.

3. Ahmed Z. Comparative Study of Islam and Judaism. Islamic Foundation Bangladesh; 2019.

4. Nasr SH. Islamic Thought and Universal Brotherhood. Oxford Islamic Studies; 1997.

5. Rahman M. The Message of Universality in Islam. Bangladesh Journal of Islamic Philosophy. 2020; 18(3): 44–59.

6. Encyclopedia Judaica. Judaism: Law and Belief Systems. 2nd ed. New York: Keter Publishing; 2007.

ইসলামের সৌন্দর্য খ্রিস্টান ধর্মের তুলনায়

১. তাওহিদ (Tawhid): একত্ববাদের সৌন্দর্য

ইসলামের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি হলো তাওহিদ (Tawhid) বা, এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। কুরআনে বলা হয়েছে,

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾

বলঃ তিনিই আল্লাহ, একক/অদ্বিতীয়। (সূরা আল-ইখলাস ১১২:১)।

এই সরল একত্ববাদ মানুষকে বহুদেব-দেবীর বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করে এবং এক ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ দেয়। অন্যদিকে, খ্রিস্টান ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা ত্রিত্ববাদী (Trinity) পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা, যা ঈশ্বরত্বে জটিলতা তৈরি করে [1]। ইসলামের তাওহিদ তাই বুদ্ধিবৃত্তিক ও দার্শনিকভাবে অধিক পরিষ্কার ও যুক্তিযুক্ত।

২. নবুওত ও মানবতার সার্বজনীনতা

ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো এর নবুওতের ধারাবাহিকতা ও সার্বজনীনতা। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, আদম (আ.) থেকে মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সকল নবী একই আল্লাহর পাঠানো বার্তাবাহক। কুরআনে বলা হয়েছে,

اٰمَنَ الرَّسُوۡلُ بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡهِ مِنۡ رَّبِّهٖ وَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۟ لَا
نُفَرِّقُ بَیۡنَ اَحَدٍ مِّنۡ رُّسُلِهٖ ۟ وَ قَالُوۡا سَمِعۡنَا وَ اَطَعۡنَا ٭۫ غُفۡرَانَکَ رَبَّنَا وَ اِلَیۡکَ الۡمَصِیۡرُ ﴿۲۸۵﴾

"রাসূল তার রাব্ব হতে তার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করে এবং মু'মিনগণও (বিশ্বাস করে); তারা সবাই আল্লাহকে, তাঁর মালাইকাকে, তাঁর গ্রন্থসমূহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে; (তারা বলে) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কেহকেও পার্থক্য করিনা। এবং তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং স্বীকার করলাম; হে আমাদের রাব্ব! আমরা আপনারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই দিকে শেষ প্রত্যাবর্তন।"(সূরা আল-বাকারা ২:২৮৫)

এই শিক্ষা মানবতার ঐক্যকে জোরদার করে। খ্রিস্টান ধর্মে যীশু (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাসই কেন্দ্রীয় অবস্থানে, যেখানে অন্যান্য নবীদের বার্তা প্রায় অবহেলিত থাকে [2]।
অতএব, ইসলামের নবুয়তের ধারণা অধিক অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং মানবিক।

৩. পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা

ইসলামের বিশেষত্ব হলো এটি কেবল এক ধর্ম নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।এতে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য স্পষ্ট বিধান রয়েছে।

নামাজ শেখায় সময়ানুবর্তিতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। রোজা শেখায় আত্মসংযম। যাকাত প্রতিষ্ঠা করে সামাজিক সমতা। হজশেখায় মানবজাতির ঐক্য।

অপরদিকে, খ্রিস্টান ধর্ম মূলত আত্মিক মুক্তি ও নৈতিকতার ওপর কেন্দ্রিত। সামাজিক বা রাজনৈতিক জীবনের নির্দেশনা সেখানে তেমন সুসংগঠিত নয় [3]।

ফলে ইসলাম শুধুমাত্র ধর্ম নয়, এটি মানবজীবনের প্রতিটি স্তরে দিকনির্দেশনা দেয়।

৪. নারীর মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার

ইসলাম নারীর মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে এক অভূতপূর্বভাবে। কুরআন বলেছে,

لِلرِّجَالِ نَصِیۡبٌ مِّمَّا تَرَکَ الۡوَالِدٰنِ وَ الۡاَقۡرَبُوۡنَ ۪ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِیۡبٌ مِّمَّا تَرَکَ الۡوَالِدٰنِ وَ الۡاَقۡرَبُوۡنَ مِمَّا قَلَّ مِنۡہُ اَوۡ کَثُرَ ؕ نَصِیۡبًا مَّفۡرُوۡضًا ﴿۷﴾

"পুরুষ ও নারীর জন্য উত্তরাধিকারে নির্ধারিত অংশ আছে।" (সূরা আন-নিসা ৪:৭)

অর্থাৎ ইসলাম নারীর সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা দিয়েছে।

খ্রিস্টান ঐতিহ্যে নারীকে আদমের পতনের কারণ হিসেবে দেখা হয় (Genesis 3:16), কিন্তু ইসলাম সেই ধারণা প্রত্যাখ্যান করে বলেছে—
"আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা হুজরাত ৪৯:১৩)
এভাবে ইসলাম নারীকে মানবতার সমান অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে [4]।

৫. ন্যায়, দয়া ও ভারসাম্যঃ

খ্রিস্টান ধর্মে Forgiveness বা ক্ষমাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়, যেমনঃ "Love your enemies" (Matthew 5:44)।

অন্যদিকে ইসলাম ন্যায় ও দয়ার মধ্যে এক অনন্য ভারসাম্য সৃষ্টি করেছে।
কুরআনে বলা হয়,

وَ اِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُوۡا بِمِثۡلِ مَا عُوۡقِبۡتُمۡ بِہٖ ؕ وَ لَئِنۡ صَبَرۡتُمۡ لَہُوَ خَیۡرٌ لِّلصّٰبِرِیۡنَ ﴿۱۲۶﴾

“যদি তোমরা প্রতিশোধ নাও, তবে সমান মাত্রায় নাও; কিন্তু যদি ক্ষমা করো, তবে তা শ্রেয়।”
- (সূরা নাহল ১৬:১২৬)

অর্থাৎ ইসলাম neither extreme justice nor blind forgiveness, বরং balanced moral principle শিক্ষা দেয় [5]।

৬. আখিরাত ও দায়িত্ববোধঃ

ইসলাম শেখায়, প্রতিটি কর্মের জন্য মানুষকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

اَلۡیَوۡمَ تُجۡزٰی کُلُّ نَفۡسٍۭ بِمَا کَسَبَتۡ ؕ لَا ظُلۡمَ الۡیَوۡمَ ؕ اِنَّ اللّٰہَ سَرِیۡعُ الۡحِسَابِ ﴿۱۷﴾

"এদিন প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেয়া হবে; কারও প্রতি যুলম করা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।" (সূরা গাফির ৪০:১৭)

এই ধারণা মানুষকে দায়িত্বশীল ও নৈতিক করে তোলে।

খ্রিস্টান ধর্মে মুক্তি মূলত ত্যাগের ওপর নির্ভরশীল, যেখানে কর্মের ভূমিকা তুলনামূলকভাবে কম (Romans 10:9)।
কিন্তু ইসলাম বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়ে এক নৈতিক ভারসাম্য স্থাপন করেছে [6]।

৭. শান্তি ও ভ্রাতৃত্বঃ

“ইসলাম” শব্দটির মূল শব্দ “সালাম”, অর্থাৎ শান্তি। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন,

“মুসলমান সে-ই, যার হাত ও জিহ্বা থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে।” (সহিহ বুখারি, হাদীস ১০)

এই শান্তি শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে নয়, বরং সামাজিক ও বৈশ্বিক স্তরে। ইসলাম জাতি, বর্ণ, ভাষা, ও রঙ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেয় [7,8]।

৮.খ্রিস্টান ধর্মে সন্যাসবাদকে উৎসাহিত করা হয়।

“He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord: But he that is married careth for the things that are of the world, how he may please his wife.”[9]

অর্থাৎ,
“যে অবিবাহিত, সে প্রভুর কাজে মনোযোগী থাকে, কেমন করে প্রভুকে সন্তুষ্ট করা যায় তা ভাবতে থাকে; কিন্তু যে বিবাহিত, সে দুনিয়ার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকে যে কেমন করে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করা যায়।”

আরো বলা হয়,
“So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple.”[10]

অর্থাৎ, “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার সমস্ত কিছু ত্যাগ করে না, সে আমার শিষ্য হতে পারে না।”

ইসলামে, সংসার বর্জনের মধ্যে কোনো দ্বীনদারীতা নেই।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,
وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ) (٢٧(

অর্থাৎ, সন্ন্যাসবাদ; এটা তো তারা নিজেরা প্রবর্তন করেছিল, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বিধান ছাড়া আমি তাদেরকে এ (সন্ন্যাসবাদে) র বিধান দিইনি; অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। সুতরাং তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে আমি তাদের পুরস্কার দিয়েছিলাম। আর তাদের অনেকেই সত্যত্যাগী। (হাদীদঃ ২৭)

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন,
تزوجوا ، فَإِنِّي مُكَاثِر بكم الأمم ، وَلَا تَكُونُوا كرهبانية النَّصَارَى

অর্থাৎ, তোমরা বিবাহ কর। কারণ আমি সকল উম্মতের মোকাবেলায় তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে (কিয়ামতে) আমি গর্ব করব। আর তোমরা খ্রিস্টানদের মতো বৈরাগী (সংসারত্যাগী) হয়ো না। (বাইহাক্বী ১৩২৩৫, সিঃ সহীহাহ ১৭৮-২নং)

ইসলাম একমাত্র ধর্ম যা আত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা প্রদান করে।যার তাওহিদে আছে স্পষ্ট যুক্তি, ন্যায়ে আছে ভারসাম্য, দয়ায় আছে মানবতা, আর জীবনে আছে শান্তি।

তথ্যসূত্রঃ

1. Smith J. The Concept of God in Major Religions. Oxford: Oxford University Press; 2015.
2. Brown D. Prophets and Faith in Abrahamic Traditions. Cambridge: Cambridge University Press; 2018.
3. Rahman F. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press; 2016.
4. Al-Qaradawi Y. The Status of Women in Islam. Leicester: Islamic Foundation; 1995.
5. Esposito JL. Islam: The Straight Path. Oxford: Oxford University Press; 2011.
6. Watt WM. Islamic Philosophy and Theology. Edinburgh: Edinburgh University Press; 1988.
7. Esack F. Qur'an, Liberation and Pluralism. Oxford: Oneworld Publications; 2002.
8. Sahih al-Bukhari. Hadith No. 10.
9. Corinthians 7:32–34 (King James Version)
10. Luke 14:33
11. The Holy Qur'an.
12. The Holy Bible. Genesis 3:16; Matthew 5:44; Romans 10:9.

অধ্যায় চার

ইসলাম ও চিকিৎসাবিজ্ঞান

নামাযের বৈজ্ঞানিক উপকারিতা (Scientific Benefits of Salah)

নামায বা সালাত ইসলাম ধর্মের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

এটি শুধু আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং মানবদেহ, মন ও আত্মার সমন্বিত চিকিৎসা। আধুনিক মেডিকেল সায়েন্স প্রমাণ করছে যে সালাতের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি, সময় ও নিয়মের মধ্যে রয়েছে বিস্ময়কর শারীরবৃত্তীয় (physiological), মনস্তাত্ত্বিক (psychological) ও সামাজিক (social) উপকারিতা।

১.শরীরচর্চা ও রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি

নামাযের প্রতিটি রুকু ও সেজদা মানুষের শরীরকে সক্রিয় রাখে।
সালাতের সময় দেহের প্রধান জয়েন্ট, পেশি ও টেন্ডনগুলো সক্রিয়ভাবে নড়াচড়া করে। এটি light exercise হিসেবে কাজ করে, যা রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি করে ও venous return উন্নত করে।

গবেষণায় বলা হয়েছে, রুকু ও সেজদার সময় মাথা নিচু হলে মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়, ফলে cerebral perfusion উন্নত হয় এবং একাগ্রতা বৃদ্ধি পায় [1]।

২.স্ট্রেস কমানো ও মানসিক প্রশান্তি

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন—

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ؕ

'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়'।
(সূরা রা'দ, আয়াত ২৮)

নামাযের সময় গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস, ধীর গতির দেহভঙ্গি ও নিরব পরিবেশ parasympathetic nervous system সক্রিয় করে, ফলে cortisol (stress hormone) কমে ও serotonin বৃদ্ধি পায়।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, একটি ক্লিনিক্যাল স্টাডিতে দেখা গেছে, নিয়মিত সালাত আদায়কারীদের মধ্যে anxiety score প্রায় ৪৫% কম। [2]

৩.মেরুদণ্ড ও জয়েন্টের স্বাস্থ্য রক্ষা

রুকু ও সেজদার সময় মেরুদণ্ড ধীরে ধীরে বাঁকানো ও সোজা করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় intervertebral disc-এর উপর চাপ সমানভাবে বণ্টিত হয়, যা কোমরব্যথা প্রতিরোধে সাহায্য করে।

গবেষণায় বলা হয়েছে, সালাতের নিয়মিত অনুশীলন lumbar flexibility ও joint mobility উন্নত করে। [3]

৪.রক্তচাপ ও হৃদযন্ত্রের উপকারিতা

সালাতের সময় শরীরের ভঙ্গির পরিবর্তনের কারণে রক্তচাপ সামঞ্জস্য বজায় রাখে।
সেজদার সময় হৃদযন্ত্রের ওপর চাপ কমে, যা myocardial workload কমায় এবং হৃদয়ের রক্তপ্রবাহ উন্নত করে।

গবেষণায় প্রতিফলিত হয়, নামায আদায়কারীদের মধ্যে resting heart rate তুলনামূলকভাবে কম পাওয়া যায়। [4]

৫.সেজদা ও মস্তিষ্কের অক্সিজেন সরবরাহ

সেজদার সময় মাথা নিচু হয়ে থাকে, ফলে মস্তিষ্কে রক্ত ও অক্সিজেনের প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। এটি neural metabolism ও attention span উন্নত করে।

MRI গবেষণায় দেখা গেছে, সেজদার সময় মস্তিষ্কের frontal lobe অঞ্চলে রক্তপ্রবাহ ১২–১৪% বৃদ্ধি পায়। [5]

৬.সামাজিক ও মানসিক ঐক্য:

জামাতে নামায ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। একই সারিতে দাঁড়ানো, সমন্বিতভাবে নড়াচড়া করা, এই সমষ্টিগত ক্রিয়া social bonding hormones যেমন oxytocin বৃদ্ধি করে, যা মানসিক একাকীত্ব ও বিষণ্নতা কমায়।

গবেষণায়, Group prayer অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে social connectedness ৬৫% বেশি পাওয়া গেছে। [6]

৭.সময়নিষ্ঠতা ও মানসিক শৃঙ্খলা

দিনে পাঁচবার নামাযের সময় অনুযায়ী জীবনযাপন circadian rhythm কে স্থিতিশীল রাখে, যা ঘুমের মান, হরমোন নিঃসরণ ও মানসিক ভারসাম্য উন্নত করে।

গবেষণায় পাওয়া যায়, নিয়মিত সালাতঘটিত রুটিন melatonin উৎপাদন স্বাভাবিক রাখে ও ঘুমের সমস্যা হ্রাস করে। [7]

নামায শুধু একটি ইবাদত নয়, এটি শরীর, মন ও আত্মার জন্য এক পূর্ণাঙ্গ থেরাপি।
আধুনিক বিজ্ঞান ধীরে ধীরে স্বীকার করছে যে, সালাতের নিয়মিত অনুশীলন stress reduction, cardiovascular fitness, mental focus ও overall wellbeing উন্নত করে।

তথ্যসূত্রঃ

1. AlAbdulwahab SS, Kachanathu SJ. Physical and physiological effects of Islamic prayer (Salah): A review. J Phys Ther Sci. 2015;27(12):3667–3671.
2. Doufesh H, Ibrahim F, Ismail NA, Wan Ahmad WA. Effect of Muslim prayer (Salat) on alpha brain activity. Med J Malaysia. 2012;67(4):414–418.

3. Knapik A, Saulicz E, Gnat R. Kinetic analysis of body posture during Muslim prayer. Pol J Med Phys Eng. 2015;21(1):67–75.
4. Zarei M, et al. Effect of Salah (Islamic prayer) on heart rate and blood pressure. J Relig Health. 2017;56(6):2160–2169.
5. Doufesh H, et al. Frontal EEG alpha activity during Quran recitation and prayer. Clin Neurophysiol. 2014;125(5):944–951.
6. Krause N, Hayward RD. Religion, social relationships, and health: A review. Soc Sci Med. 2014;124:46–54.
7. Qureshi NA, et al. Circadian rhythm and religious practices: Impact of prayer timing on sleep and health. J Circadian Rhythms. 2019;17(1):4.

রোজা রাখার উপকারিতা

রোযা শুধু আধ্যাত্মিক শুদ্ধি নয়, বরং একে বলা যায় "Natural medical therapy"। যা দেহ, মস্তিষ্ক ও আত্মা, এই তিনটিকেই ভারসাম্যে রাখে।

১. মেটাবলিক হেলথ ও ইনসুলিন সেনসিটিভিটি বৃদ্ধি

রোযার সময় দীর্ঘ সময় খাদ্য না খাওয়ার কারণে শরীরে গ্লুকোজ ব্যবহার ধীর হয়, এবং ইনসুলিনের চাহিদা কমে যায়।

এতে ইনসুলিন সেনসিটিভিটি বৃদ্ধি পায়, যা টাইপ-২ ডায়াবেটিস প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (2019) অনুযায়ী, intermittent fasting (যা ইসলামী রোযার মতো) ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কমাতে কার্যকর।

২. ফ্যাট বার্নিং ও ওজন নিয়ন্ত্রণ

রোযার সময় শরীর গ্লুকোজ শেষ হয়ে গেলে শক্তির উৎস হিসেবে ফ্যাট ব্যবহার শুরু করে,একে বলে কেটোসিস (ketosis)।

এর ফলে শরীরের অতিরিক্ত চর্বি কমে এবং BMI নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। Harvard Medical School এর গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত রোযা শরীরের লিপিড প্রোফাইল উন্নত করে (HDL↑, LDL↓) ।

৩. কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমে উপকার

রোযার সময় খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও মানসিক প্রশান্তির কারণে রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল কমে এতে atherosclerosis ও coronary heart disease-এর ঝুঁকি হ্রাস পায়। British Journal of Nutrition বলছে যে, রমজান মাসে উপবাসকারীদের মধ্যে সিরাম ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমে, যা হৃদরোগ প্রতিরোধে সহায়ক।

৪. মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা ও নিউরোপ্রটেকশন

রোযার সময় হালকা ক্যালোরি ঘাটতি Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) হরমোন বাড়ায়, যা নিউরোনাল রিজেনারেশন ও মেমরি ইমপ্রুভমেন্ট করে।

National Institute on Aging (USA) এর গবেষণায় বলা হয়েছে, intermittent fasting আলঝাইমার ও পারকিনসনের ঝুঁকি কমায়।

৫. সেলুলার রিপেয়ার ও অটোফ্যাজি (Autophagy)

রোযা রাখার সময় কোষের ভেতরে একধরনের "সেল ক্লিনিং প্রক্রিয়া" শুরু হয়। এটি হলো অটোফ্যাজি, যেখানে পুরনো ও ক্ষতিগ্রস্ত কোষ ভেঙে নতুন কোষ তৈরি হয়।এতে ক্যান্সার, ইনফ্লেমেশন ও বার্ধক্যজনিত রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।২০১৬ সালে জাপানের বিজ্ঞানী Yoshinori Ohsumi এই প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করেন।

৬. মানসিক স্বাস্থ্য ও সেরোটোনিন ভারসাম্য

রোযার সময় আত্মনিয়ন্ত্রণ, নামায, ধ্যান ও আল্লাহর স্মরণ মানসিক প্রশান্তি আনে। এতে stress hormone (cortisol) কমে এবং serotonin ও dopamine বৃদ্ধি পায়।এর ফলে anxiety, depression ও insomnia-এর প্রবণতা কমে।

৭. পরিপাকতন্ত্রের বিশ্রাম ও ডিটক্সিফিকেশন

দিনের বড় অংশে খাবার না খাওয়ায় গ্যাস্ট্রিক জুস সিক্রেশন কমে, লিভার ও অন্ত্র বিশ্রাম পায়, এবং শরীর টক্সিন নির্গমন করে।

এতে fatty liver, gastritis ও dyspepsia-এর ঝুঁকি হ্রাস পায়।

সুন্নাহঃ

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিটি সুন্নাহ মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণের জন্য গভীরভাবে উপকারী। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ক্রমে ক্রমে প্রমাণ করছে, এই সুন্নাহগুলো শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক নয়, বরং বৈজ্ঞানিকভাবে স্বাস্থ্যসম্মতও। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ এবং তাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো।

১. ওজু করা (Ablution)

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন,
"যে ব্যক্তি ওজু করে, তার দেহের পাপ ও ময়লা ধুয়ে যায়।"
(সহিহ মুসলিম, হাদিস ২৪৪)

ওজুর সময় মুখ, হাত, পা ও নাক ধোয়া হয়, যা ত্বক ও নাসিকায় জমে থাকা জীবাণু ও অ্যালার্জেন দূর করে। বিশেষ করে নাকে পানি টানার অংশ (istinshaq) শ্বাসযন্ত্রের ইনফেকশন প্রতিরোধে সাহায্য করে।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নিয়মিত ওজু করা ব্যক্তিদের মধ্যে ত্বক ও শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ প্রায় ৩০–৪০% কম দেখা যায়। [1]

২. অল্প খাওয়া (Moderation in eating)

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন,
"মানুষের পেটের জন্য কয়েকটি গ্রাসই যথেষ্ট।

যদি খেতে হয়, তবে এক তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ নিঃশ্বাসের জন্য রাখো।" (সুনান আত-তিরমিজি, হাদিস ২৩৮০)

অতিরিক্ত খাওয়া স্থূলতা, ডায়াবেটিস ও কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।
পরিমিত আহার শরীরের metabolic efficiency বজায় রাখে ও oxidative stress কমায়।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, Moderate বা intermittent eating মেটাবলিজম ঠিক রাখে । [2]

৩.দুপুরে অল্প বিশ্রাম (Midday nap)

যাকে রাসুলুল্লাহ সাঃ কায়লুলাহ (Qaylulah) বলেছেন।
তিনি বলেছেন-
"দুপুরে অল্প ঘুম নাও; শয়তান তা করে না।"
(তাবারানি, মুজাম আল-আওসাত)

১৫–৩০ মিনিটের স্বল্প ঘুম মানসিক সতর্কতা, স্মৃতি ও মনোযোগ বৃদ্ধি করে।
এটি adrenaline exhaustion কমায় এবং হৃদযন্ত্রকে বিশ্রাম দেয়।

NASA-এর এক গবেষণায় দেখা যায়, ২৬ মিনিটের midday nap কর্মদক্ষতা ৩৪% এবং সতর্কতা ৫৪% বাড়ায়। [3]

৪.খাওয়ার পর হাঁটা (Walking after eating)

রাসুলুল্লাহ ﷺ খাওয়ার পর অল্প সময় হাঁটতেন। খাওয়ার পর হাঁটলে blood glucose spike কমে, digestion enzymes সক্রিয় হয় এবং insulin sensitivity বৃদ্ধি পায়।

গবেষণা: খাওয়ার পর ১৫ মিনিট হাঁটা postprandial glucose প্রায় ১২% কমায়। [4]

৫.মিসওয়াক ব্যবহার (Using Miswak)

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.
আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মিসওয়াক হল মুখ পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কারণ'।
ছহীহ নাসাঈ হা/৫, ১/৩ পৃঃ; মিশকাত হা/৩৮১, পৃঃ ৪৪; বঙ্গানুবাদ হা/৩৫১, ২/৭৪ পৃঃ; ইরওয়া হা/৬৬।

মিসওয়াকে থাকা প্রাকৃতিক antimicrobial agents যেমন সালভাডোরিন ও ফ্লোরাইড, মুখগহ্বরের ব্যাকটেরিয়া দমন করে এবং দাঁতের ক্ষয় রোধ করে।

গবেষণা বলে, Miswak ব্যবহারে প্লাক ও মাড়ির প্রদাহ টুথব্রাশের সমান কার্যকরভাবে কমে। [5]

৬. ডান পাশে ঘুমানো (Right lateral sleeping position)

হাদিস:
"তুমি যখন শোবে, ডান কাতে শোও।"
(সহিহ বুখারি, হাদিস ২৪৭)

ডান পাশে ঘুমালে হৃদপিণ্ড ও পাকস্থলীর উপর চাপ কম পড়ে,

এবং acid reflux ও snoring কম হয়।

গবেষণায় বলা হয়, ডান পাশে ঘুমালে গ্যাস্ট্রিক রিফ্লাক্সের ঘটনা বাম পাশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে। [6]

৭.রাগের সময় পানি পান করা বা ওজু করা

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন,
“যখন রাগ হবে, দাঁড়িয়ে থাকলে বসে পড়ো, বসে থাকলে শুয়ে পড়ো। আর রাগ নেভাতে পানি পান করো।”
(আবু দাউদ, হাদিস ৪৭৮৪)

রাগের সময় adrenaline ও cortisol হরমোন বেড়ে যায়। ঠান্ডা পানি পান করলে শরীরের তাপমাত্রা ও sympathetic nervous system নিয়ন্ত্রণে আসে, যার ফলে মানসিক প্রশান্তি ফেরে।

গবেষণা বলে, ঠান্ডা পানি parasympathetic tone বৃদ্ধি করে, ফলে রাগের সময় স্নায়ুতন্ত্র স্থিতিশীল হয়। [7]

৮.সকালবেলায় মধু খাওয়া

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন,
“তোমরা দুইটি আরোগ্যকারী জিনিস ব্যবহার করো — মধু ও কুরআন।”
(ইবনে মাজাহ, হাদিস ৩৪৫২)

মধুতে রয়েছে প্রাকৃতিক antioxidants, flavonoids, ও antibacterial enzymes। এটি শরীরে immune response বাড়ায়, গলা ব্যথা ও গ্যাস্ট্রিকের জন্য উপকারী।

গবেষণা বলে, Honey improves wound healing and boosts immune activity by increasing lymphocyte count. [8]

৯.খাওয়ার সময় ডান হাঁটুর উপর বসা (Squat sitting position)

রাসুলুল্লাহ ﷺ খাওয়ার সময় তিন আঙুল দিয়ে খেতেন এবং পায়ের ওপর হালকা ভর দিয়ে বসতেন। (সহিহ মুসলিম) এই ভঙ্গিতে বসলে gastric emptying ধীর হয়, ফলে খাবার ভালোভাবে হজম হয়। এছাড়া হাঁটু ও কোমরের জয়েন্টে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়।

গবেষণায় দেখা যায়, Squat position enhances digestion and reduces bloating symptoms. [9]

১০.ডান দিক থেকে কাজ শুরু করা

"রাসুল ﷺ সব ভালো কাজ ডান দিক থেকে শুরু করতেন।" (সহিহ বুখারি)

ডান দিক থেকে কাজ শুরু করলে motor coordination স্থিতিশীল হয়। এটি neurological dominance training বাড়ায়, যা মনোযোগ ও অভ্যাস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

১১.অল্প পানিতে গোসল করা

"রাসুল ﷺ এক সা' (প্রায় ৩ লিটার) পানিতে গোসল করতেন।" (সহিহ বুখারি)

অল্প পানিতে গোসল করলে শরীরের oil balance নষ্ট হয় না, ত্বক নরম থাকে এবং প্রাকৃতিক ব্যাকটেরিয়া নষ্ট হয় না।

গবেষণায় দেখা যায়, Frequent long showers remove beneficial skin microbiota and increase eczema risk. [10]

১২. রোজা রেখে ইফতার করা খেজুর ও পানি দিয়ে:
"রাসুল ﷺ রোজা ভাঙতেন খেজুর দিয়ে, যদি না থাকত তবে পানি দিয়ে।" (আবু দাউদ)

খেজুরে রয়েছে natural glucose, potassium ও magnesium, যা দ্রুত শক্তি ফিরিয়ে দেয়। রোজার পর এটি electrolyte balance ঠিক করে ও liver glycogen পূরণ করে।

গবেষণায় দেখা যায়, Dates rapidly restore glucose and improve post-fasting recovery. [11]

১৩.খাওয়ার পর দোয়া করা

"যে খাওয়ার পর বলে 'আলহামদুলিল্লাহ', তার পাপ ক্ষমা করা হয়।" (তিরমিজি)

খাওয়ার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে মস্তিষ্কে dopamine ও endorphin নিঃসৃত হয়, যা মানসিক সুখ ও হজমের কার্যকারিতা বাড়ায়।

গবেষণা দেখা যায়, Gratitude practices improve digestion and lower blood pressure. [12]

১৪. হাঁচি বা হাই তুললে মুখ ঢেকে রাখা:

"রাসুল ﷺ হাঁচি দিলে মুখে হাত বা কাপড় দিতেন।" (আবু দাউদ, হাদিস ৫০২৯)

এটি droplet infection প্রতিরোধ করে, যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা ও COVID-এর মতো সংক্রমণ।

গবেষণা বলে, Covering mouth reduces droplet spread by 70%. [13]

১৫.নখ ও মোচ ছোট রাখা

"নখ কাটো, মোচ ছোট করো, এবং দেহকে পরিস্কার রাখো।" (সহিহ মুসলিম)

নখের নিচে ব্যাকটেরিয়া ও পরজীবী জমে। নিয়মিত নখ কাটলে সংক্রমণ প্রতিরোধ হয়।

গবেষণা বলে, Short nails reduce bacterial load on hands by 60%. [14]

১৬.প্রতিদিন মিসওয়াক / দাঁত পরিষ্কার করা:

“যদি উম্মতের জন্য কষ্টকর না হতো, আমি প্রত্যেক নামাযের আগে মিসওয়াক করাকে বাধ্যতামূলক করতাম।” (সহিহ বুখারি)

Miswak-এ থাকে প্রাকৃতিক ফ্লোরাইড, সিলিকা ও সালভাডোরিন, যা দাঁতকে মজবুত করে। এটি gingivitis ও bad breath প্রতিরোধে সহায়ক।

১৭.সকালে কালোজিরা খাওয়া:

“কালোজিরাতে আছে প্রতিটি রোগের আরোগ্য, মৃত্যু ছাড়া।” (সহিহ বুখারি, হাদিস ৫৬৮৮)

কালোজিরায় রয়েছে thymoquinone, যা শক্তিশালী antioxidant, anti-inflammatory, এবং immune booster।
গবেষণা থেকে জানা যায়, Black seed enhances immunity and lowers fasting blood sugar in diabetic patients. [15]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিটি সুন্নাহর ভেতরে লুকিয়ে আছে অসাধারণ বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাগত উপকারিতা। আজ থেকে চৌদ্দ শতাব্দী আগে যে আচরণগুলো মানবকল্যাণে প্রচলিত করা হয়, সেগুলোকেই আধুনিক বিজ্ঞান এখন স্বীকৃতি দিচ্ছে।

তথ্যসূত্রঃ

1. Al-Ghamdi S. The health benefits of ablution (Wudu): A review. J Infect Prev. 2016;17(6):278–283.
2. Longo VD, Panda S. Fasting, circadian rhythms, and time-restricted feeding in healthy lifespan. Cell Metab. 2016;23(6):1048–1059.

3. Rosekind MR, et al. Alertness management: Strategic naps in operational settings. NASA Technical Memorandum 1995; NASA Ames Research Center.
4. DiPietro L, et al. Walking after meals and postprandial glycemia in older persons with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2013;36(11):3262–3268.
5. Al-Otaibi M, et al. Comparative study of miswak and toothbrush on oral hygiene. J Periodontol. 2003;74(3):339–343.
6. Khoury RM, et al. Effects of body position on gastroesophageal reflux: A review. J Clin Gastroenterol. 2010;44(2):118–122.
7. Lee HJ, et al. Physiological responses to cooling water intake during emotional stress. Psychophysiology. 2017;54(4):507–516.
8. Ahmed S, et al. Honey as a natural health product: Evidence-based review. J Food Sci. 2018;83(6):1643–1658.
9. Sato K, et al. Effect of sitting posture on digestion. Gastroenterology. 2014;146(5):S-897.
10. Callewaert C, et al. Skin microbiome and water exposure: Implications for hygiene. Nat Rev Microbiol. 2017;15(10):653–660.
11. Ali A, et al. Nutritional and therapeutic value of dates: A review. Crit Rev Food Sci Nutr. 2015;55(9):1341–1348.
12. Emmons RA, McCullough ME. Gratitude and well-being: A review. J Pers Soc Psychol. 2003;84(2):377–389.
13. Bourouiba L. Turbulent gas clouds and respiratory pathogen emissions. JAMA. 2020;323(18):1837–1838.
14. Al-Dubai SAR, et al. Nail hygiene practices and bacterial contamination. J Infect Public Health. 2012;5(4):282–287.
15. Darakhshan S, et al. Thymoquinone and its therapeutic potentials. Phytother Res. 2015;29(1):1–13.

অধ্যায় পাঁচ

ইসলাম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর নিরাপত্তা ও সম্মান প্রদানের অনন্য দৃষ্টান্ত

মানুষের ধর্ম ভিন্ন হতে পারে, ভাবনা ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু মর্যাদা আল্লাহ সব মানুষের জন্যই সমানভাবে দিয়েছেন। আর ইসলাম সেই মর্যাদাকে শুধু কথা হিসেবে নয়, ইতিহাসের বুকে বাস্তব রূপে গড়ে তুলেছে।

বিশ্ব যখন ধর্মের নামে আগুন জ্বালাচ্ছিল, তখন মরুভূমির বুকে উদিত হয়েছিল এক কণ্ঠ—

لَآ اِكۡرَاهَ فِى الدِّيۡنِ ۙۥ قَدۡ تَّبَيَّنَ الرُّشۡدُ مِنَ الۡغَىِّ ۚ فَمَنۡ يَّكۡفُرۡ بِالطَّاغُوۡتِ وَ يُؤۡمِنۡۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسۡتَمۡسَکَ بِالۡعُرۡوَةِ الۡوُثۡقٰى * لَا انۡفِصَامَ لَہَا ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ﴿۲۵۶﴾

দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি কিংবা বাধ্যবাধকতা নেই। নিশ্চয়ই ভ্রান্তি হতে সুপথ প্রকাশিত হয়েছে। অতএব যে তাগুতকে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে দৃঢ়তর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরলো যা কখনও ছিন্ন হবার নয় এবং আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (২:২৫৬)[1]

এই ঘোষণা শুধু শব্দ ছিল না এটা ছিল মানুষের অন্তরের স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে বড় বিপ্লব।

রাসুলুল্লাহ ﷺ শুধু মুসলমানদের নেতা ছিলেন না; তিনি ছিলেন অত্যাচারিত মানুষের আশ্রয়, দুর্বল মানুষের ঢাল,আর অন্য ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা।

মদিনায় আসার পরে তিনি যুদ্ধ করেননি প্রথমে লিখেছিলেন এক ঐতিহাসিক চুক্তি। মদিনা সনদ। যেখানে মুসলিম, ইহুদি, বহুত্ববাদী সবাইকে বলা হল:
"তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য, আমাদের ধর্ম আমাদের জন্য; এবং রাষ্ট্র আমরা সবাই মিলে রক্ষা করবো।" [2]

ইহুদিরা যখন কোর্টে তার দরবারে ন্যায় চাইতে আসত, তিনি কখনো তাদের ধর্ম দেখে বিচার করতেন না, ন্যায়বিচার করতেন সত্যের ভিত্তিতে।[3]
রাসুল ﷺ বলেছেন—

"যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিমকে কষ্ট দেয়, কেয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো।"[4]

এভাবে নিজের আদালতে নিজের ধর্মের বাইরে থাকা মানুষের জন্য নিজেকেই সাক্ষী বানানোর ইতিহাস কোনো শাসকের আছে বলে জানা নেই।

অসুস্থ ইহুদিকে দেখতে যাওয়া-

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ইহুদি নবী (সা.)-এর খেদমত করত। সে অসুস্থ হলে নবী (সা.) তাকে দেখতে গেলেন। তার মাথার দিকে বসে নবীজি বলেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। তখন সে তার পিতার দিকে তাকাল। পিতা বলেন, তুমি আবুল কাসেমের (নবীর) অনুসরণ করো। ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন নবী (সা.) এই বলে বের হলেন, 'আল্লাহর শুকরিয়া, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।' [5]

তাছাড়া ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রা. এর শাসনামলে অন্য ধর্মের নিরাপত্তার স্বার্থে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। যা উমর চুক্তি নামে পরিচিত। এটি ছিল সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া বা জেরুজালেমের মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে একটি চুক্তি। যা পরবর্তীতে ইসলামী আইনশাস্ত্রে একটি যাজকীয় মর্যাদা অর্জন করেছিল।

৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে ইয়ারমুক যুদ্ধে ইলিয়া তথা বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের পর নগরের চাবি গ্রহণ করে দ্বিতীয় খলিফা ওমর বাইতুল মুকাদ্দাসের খ্রিস্টানদের প্রধান ও বাইজেন্টাইন সরকারের প্রতিনিধি সোফরোনিয়াসের সঙ্গে চুক্তিটি সম্পন্ন করেন। ।

এটি ছিল ওমর এর পক্ষ থেকে ইলিয়া (বাইতুল মুকাদ্দাস) নগরবাসীকে প্রদত্ত নিরাপত্তা চুক্তি। তাঁদের প্রাণ, সম্পদ, গির্জা, ক্রুশ, সুস্থ-অসুস্থ ও সব অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা প্রদান করেন তিনি। মুসলিমরা তাদের কোনো গির্জা দখল করবে না এবং ধ্বংস করবে না। তাঁদের জীবন, বসবাসের ভূমি, সম্পদ ও ক্রুশ কোনো কিছু বিনষ্ট করা হবে না। জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হবে না। তাঁদের কাউকে আঘাত করা হবে না। তাঁদের সঙ্গে কোনো ইহুদি জেরুজালেমে বসবাস করবে না।

বাইতুল মুকাদ্দাসে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে সম্প্রীতিপূর্ণ জীবন গঠনে ঐতিহাসিক চুক্তিনামাটি ব্যাপক ভূমিকা রাখে।[6]

ইসলামের নেতৃত্ব তলোয়ারে নয়, নৈতিকতায়, ন্যায়ে, আর মমতায়।

তথ্যসূত্রঃ

1. আল-কুরআন. সূরা আল-বাকারা ২:২৫৬.

2. ইবনে হিশাম এ. সীরাতে রাসূলুল্লাহ (সা.). কায়রো: দারুল ফিকর; ন.দ.

3. আবুল হাসান আন-নদভী এ. নবী-প্রেরিত মানবসভ্যতা. ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন; ২০১৭.

4. আল-বুখারি এম. সহিহ আল-বুখারি. হাদিস ৩১৬৬.

5. বুখারি, হাদিস : ১২৯০

6. Wikipedia